হত্যা হাহাকারে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হত্যা হাহাকারে

কলকাতা হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে! এক-একজন মানুষ যে পাগল হয়ে যায় একথা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু একটা গোটা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে শুনলে তোমাদের মনে খটকা লাগতে পারে নিশ্চয়ই।

তবু কথাটা সত্য। ওই শোনো। হাজার-হাজার কণ্ঠে আকাশ-কাঁপানো ওই বিকট চিৎকার শোনো। জয়-হিন্দ! বন্দে মাতরম্! আল্লা হো আকবর!

ওই দ্যাখো। নিকটে, সুদূরে বাড়ির পর বাড়ি জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে সমুজ্জ্বল রক্তের মতো রাঙা টকটকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা এবং অতিকায় কৃষ্ণ অজগরের মতো ধূম্রকুণ্ডলীর পর ধূম্রকুণ্ডলী সারে-সারে ওপরে উঠে যাচ্ছে যেন ছোবল মারবে বিপুল শূন্যের বুকে।

শুনতে পাচ্ছ না সুতীব্র আর্তধ্বনি? শুনতে পাচ্ছ না ঘন ঘন বন্দুক ও বোমার ভয়াল গর্জন এবং পলাতকদের অতি দ্রুত পদশব্দ?

হ্যাঁ, কলকাতা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে এবং অরণ্যচারী ব্যাঘ্র ও সিংহের নৃশংস আত্মা এসে আজ দখল করেছে নগরবাসী মানুষদের বক্ষ।

অধিকতর ভয়াবহ রাত্রি নেমে এল শহরের ভিতরে, দিকে দিকে দুলিয়ে দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা। পথে-পথে গ্যাসপোস্টগুলোর আলোকচক্ষু আজ অন্ধ, ট্রাম, বাস ও ট্যাক্সির চলাচল বন্ধ, একেবারে বোবা ফিরিওয়ালাদের কণ্ঠ, দোকানদাররা দোকানের ঝপ তুলে দিয়ে পলায়ন করেছে, সাধারণ পথিকরা আত্মগোপন করেছে আপন আপন ঘর-বাড়ির অন্তরালে এবং প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। কিন্তু তবু মৌন হল না কলকাতার মুখর পাগলামি, রাত্রির অন্ধকারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চতুর্দিক থেকে জেগে উঠছে তার প্রচণ্ড ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। রাজপথ যেখানে জনশূন্য সেখানেও

সেই সব বন্য চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বদ্ধদ্বার বাড়িগুলোর ছাদের থেকে। মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করছে হাজার হাজার শঙ্খও।

জয় হিন্দ! বন্দেমাতরম্! আল্লা হো আকবর!

মানিক বললে, জয়ন্ত আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা গয়া।

জয়ন্ত বললে, সে কথা আর বলতে। কিন্তু হিন্দুরা কী নির্বোধ!

-কেন?

তারা বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করছে। কিন্তু বন্দেমাতরম্ কি নরহত্যার, ভ্রাতৃহত্যার মন্ত্র?

–মুসলমানদের সম্বন্ধেও তুমি ওই প্রশ্ন করতে পারো। আল্লা হো আকবর বলতে কি বোঝায় হিন্দুর মুণ্ডচ্ছেদ করা?

–ঠিক বলেছ মানিক। আজ একসঙ্গে হিন্দু আর মুসলমানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

হুঁ। আজ সারারাত জেগে এই সব চিৎকার শুনলে সকালে আমাদেরও মাথা হয়তো ঠিক থাকবে না।

–তাহলে দুই কানে তুলো গোঁজবার চেষ্টা করব।

না, ঠাট্টা নয় জয়ন্ত। এসো, জানলাগুলো বন্ধ করে শুয়ে পড়া যাক। তারপর সকালে উঠে দেখা যাবে, পথঘাটের অবস্থা কীরকম।

জয়ন্ত ও মানিক সকালবেলায় যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক গণ্ডগোল বোধ করি শ্রান্ত হয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে দু-চারজন এখনও জয় হিন্দ প্রভৃতি বলবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরগুলো যথেষ্ট কাহিল হয়ে

পড়েছে। বলে মনে হচ্ছে। তবে তরুণ সূর্য্যের সোনালি হাসির ভিতরেও চারিদিকে বিরাজ করছে কেমন একটা থমথমে অপার্থিব ভাব।

আগে প্রতিদিনই যারা নরহত্যা করবার ব্রত নিয়ে জনবহুল পথে-পথে দিগবিদিক জ্ঞানহারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়াত, সেই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির দল এখনও সাহস সঞ্চয় করে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। যে দু-একখানা মোটর দেখা যাচ্ছে, তা হয় ডাক্তার-মার্কার আশ্রয় নিয়েছে, নয় বহন করছে পুলিশের লালপাগড়িওয়ালাদের।

জায়গায়-জায়গায় দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় জনতা। সেখানে সবাই কথা কইছে উত্তেজিতভাবে এবং অনেকেরই হাতে রয়েছে ছোরা, ভোজালি, লোহার ডান্ডা, পাইপ বা শিক্ এবং এমন সব পলকা লাঠি বা বাঁখারি,–একটা বিড়াল মারতে গেলেও যা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

মাঝে-মাঝে হঠাৎ দলে-দলে লোক উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করছে উর্ধ্বশ্বাসে।

মানিক একটা ছুটন্ত লোকের হাত ধরে ফেলে শুধোলে, আরে মশাই, ব্যাপার কী?

জানি না মশাই, জানি না।

তবে এত ছুটছেন কেন?

সবাই ছুটছে বলেই ছুটছি। ইচ্ছা করলে আপনিও ছুটতে পারেন।

না, আমার সে ইচ্ছা নেই। আপনিই ছুটুন। যত পারেন ছুটুন–প্রাণপণে ছুটুন!

মানিক হাত ছেড়ে দিলে। লোকটি আবার ছুটতে শুরু করলে।

জয়ন্ত হাসলে, মানিকও হাসলে বটে, কিন্তু তাদের সে হাসির মধ্যে নেই কিছুমাত্র কৌতুকের আবেগ। রাজপথ হয়ে উঠেছে আজ ভীষণ। তার দিকে তাকালেও শিউরে ওঠে অন্তরাত্মা।

রাজপথ হয়েছে আজ অসংখ্য মানুষের অন্তিমশয্যা। মৃতদেহ, মৃতদেহ আর মৃতদেহ। কোথাও একজন কি দুজন এবং কোথাও বা চার-পাঁচজন মানুষের মৃতদেহ। কোথাও বা রাশি রাশি মৃতদেহের ওপরে মৃতদেহ পড়ে গঠন করেছে বীভৎস স্তুপের পর স্তূপ। প্রত্যেকেরই নিশ্চেষ্ট দেহের ভঙ্গি একান্ত অস্বাভাবিক, প্রত্যেক দেহই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। দেহহীন মুণ্ড এবং মুণ্ডহীন দেহেরও অভাব নেই। কাটা পা আর হাতও পড়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। সর্বত্র রক্তের ছড়াছড়ি রক্তধারায় পথ হয়েছে পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত। সেসব ভয়ানক দৃশ্য অসহনীয়। যেটুকু বললুম তাই যথেষ্ট, আরও বেশি বর্ণনা করে লাভ নেই। মানুষের প্রতি মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, কলকাতার রাজপথে পাওয়া যায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

হঠাৎ মানিক সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, জয়ন্ত দাঁড়াও!

কী হয়েছে মানিক?

–এখানে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। বরেনবাবুর মৃতদেহ। ইনি আমার পরিচিত। বন্ধু বললেও চলে।

–কে বরেনবাবু?

বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী। আমার কাছে তুমিও এর নাম শুনেছ।

বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী। আনন্দপুরের জমিদার?

–হ্যাঁ।

জয়ন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

একটি পরমসুন্দর মানুষের সুগঠিত দেহ। মুখ-চোখ সুশ্রী, বর্ণ গৌর। দেখলেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! দেহের ভঙ্গি স্বাভাবিক। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভদ্রলোক যেন ঘুমিয়ে আছেন নিশ্চিন্ত আরামে। কিন্তু তার বুকের ওপর রয়েছে একটা কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন।

জয়ন্ত দেহের পাশে বসে পড়ল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে ক্ষতচিহ্নটা। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, মানিক, আমার বিশ্বাস, এই ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মারা পড়েননি। এ হচ্ছে সাধারণ হত্যাকাণ্ড। কেউ একে অন্য জায়গায় খুন করে পুলিশকে ঠকাবার জন্যে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে।

.

দুই । মড়ার ওপরে খড়্গাঘাত

বরেনবাবুর মৃতদেহ নিয়ে আরও ভালো করে পরীক্ষায় নিযুক্ত হল জয়ন্ত।

হঠাৎ পিছন থেকে উৎসাহিত কণ্ঠে শোনা গেল, আরে হুম! মানিক নাকি?

ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর। ফিরে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, এত সকালে সুন্দরবাবু রাস্তায় যে? প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি?

সুন্দরবাবু এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, হেঁঃ, প্রাতঃভ্রমণেই বেরিয়েছি বটে। পুলিশের চাকরি নিয়ে আমরা কি আর মনুষ্য-পদবাচ্য আছি! আমরা শকুনি হে, শকুনি! যেখানে মড়া, সেইখানেই আমরা। রাজপথ হয়েছে আজ মড়কের বিছানা, আমরা কি এখানে না এসে থাকতে পারি? আরে কে ও, জয়ন্ত যে! তোমার সামনে একটা মড়া! বাপ, তুমি তো আর পুলিশে চাকরি করো না, তবে শখ করে মড়া ঘাঁটতে বেরিয়েছ কেন?

জয়ন্ত জবাব দিলে না, মুখও তুললে না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, এই মৃতদেহটি আমার এক বন্ধুর। ইনি আনন্দপুরের জমিদার, নাম বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী।

–শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু উপায় কী আর আছে ভাই? দেশে সাংঘাতিক ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বেঁধেছে, তোমার-আমার কত বন্ধুকেই যে আত্মদান করতে হবে তা কে জানে?

মানিক বললে, না সুন্দরবাবু, জয়ন্ত বলছে বরেন্দ্রবাবু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মারা পড়েননি।

–বটে, বটে। জয়ন্ত এমন কথা বলছে কেন?

–তার মতে কেউ এঁকে অন্য জায়গায় খুন করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে।

খুনির এতটা পরিশ্রম করবার কারণ কি?

–খুনি পুলিশকে ঠকাতে চায়। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলে চালিয়ে দিতে পারলে পুলিশ জোর-তদন্ত না করতেও পারে।

লাশের গায়ে কি খুনির মনের কথা লেখা আছে?

–আমি জানি না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করুন।

কী হে জয়ন্ত, তুমি মিশরের মমির মতো চুপ মেরে আছ কেন? মানিকের কথা কি সত্য?

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ।

–এই ভদ্রলোক এখানে মারা পড়েননি?

–না।

–কেমন করে জানলে?

জয়ন্ত বললে, প্রথমত ইনি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা পড়েননি, খুব সহজেই সে সন্দেহ হয়। ইনি হিন্দু আর এটা হচ্ছে একেবারে হিন্দু পাড়া। এখানে হঠাৎ কোনও মুসলমান এসে একে হত্যা করতে পারে না। অন্য কোথাও খুন করে মুসলমানরা যে হিন্দু পাড়ায় এসে লাশ ফেলে যেতে সাহস করবে, তাও মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাস্তায় রাস্তায় কেউ যদি মারা যায়, তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।

–এ কথা মানি।

–তারপর শুনুন। আমি মৃতদেহ ভালো করে পরীক্ষা করেছি। বাঁ-দিকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাঁজরার মাঝখানে কেউ ছোরা দিয়ে আঘাত করেছে। ছোরা প্রবেশ করেছে স্টার্নাম বা বুকাস্থির খুব কাছেই। ওই রকম আঘাতে মৃত্যু হয় প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু সে আঘাতে বরেন্দ্রবাবু মারা পড়েননি।

তবে? মৃতদেহে তো আর কোনও আঘাতেরই চিহ্ন দেখছি না!

–আগে আমার সব কথা শুনুন। অস্ত্রে কেবল বাঁ পাশের ফুসফুসই জখম হয়নি, দেহের দুটো প্রধান ধমনীও–পালমনারী, আর অ্যাওর্টা–আংশিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ তাই- ই।

–এটা তো আত্মহত্যার মামলাও হতে পারে?

–পারে। মৃত্যু হয় যেখানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আত্মঘাতীর অস্ত্র সেখানে হয় ক্ষতস্থানে, নয় তো হাতের মুঠোর মধ্যে, নয়তো দেহের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কোনও অস্ত্রই দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এটা আত্মহত্যার মামলা হতে পারে না।

–মৃত্যু হয়েছে রাস্তায়। যদি কোনও পথিক ছোরাখানা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে?

–প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত। আদালতে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন ওঠবার সুযোগ নেই। কারণ বলছি। ক্ষতস্থানটা দেখুন। জীবন্ত দেহে অস্ত্রাঘাত করলে

ক্ষতস্থানটা বেশি ফাঁক হয়ে যায়, কারণ সে ক্ষেত্রে জ্যান্ত চামড়া হয় সঙ্কুচিত। মৃতদেহের ত্বক সঙ্কুচিত হয় না, তাই ক্ষতস্থানের ফাঁকও বড় হতে পারে না। এই দেহটার ক্ষতস্থানের মুখ কীরকম সংকীর্ণ, দেখছেন তো? এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, তুমি কী বলতে চাও জয়ন্ত, এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর হত্যাকারী দেহের ওপরে অস্ত্রাঘাত করেছে?

–ঠিক তাই। আরও প্রমাণের অভাব নেই। জীবন্ত দেহের ক্ষতস্থান রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, জামাকাপড়ও হয় রক্তে আরক্ত। কিন্তু এই ক্ষতটা দেখুন, এর ওপরে রক্ত জমাট হয়ে নেই। জামাকাপড়েও রক্তের দাগ নেই বললেই চলে।

–তোমার আর কিছু বলবার আছে?

আছে। বলেছি, খুনির অস্ত্র দেহের দুটি প্রধান ধমনী দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। জীবন্ত অবস্থায় এই দুটি নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে প্রবাহমান রক্তধারায়। মৃত্যুর পর এই ধমনী দুটো প্রায় রক্তশূন্য হয়ে যায়। সুতরাং বরেনবাবু বেঁচে থাকতে যদি কেউ তার বুকে অস্ত্রাঘাত করত, তাহলে যে কোটরের ভিতর ওই দুটো ধমনী আছে, তা রক্তে রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখছি রক্ত আছে যৎসামান্য–যা নগণ্য বললেও চলে।

সুন্দরবাবু তাঁর বিখ্যাত টাক চুলকাতে, বললেন, হুম! খুনি মড়ার ওপরে করেছে খড়্গাঘাত?

নিশ্চয়!

–কিন্তু কেন?

–লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। বরেনবাবুর শবব্যবচ্ছেদ করলেই খুব সম্ভব জানা যাবে যে, আগে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। খুনি তারপর মড়ার ওপরে ছোরা মেরে লাশটাকে রাস্তায় বহন করে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা চলছে বীভৎস সমারোহে শহরের পথে-পথে মৃতদেহের ছড়াছড়ি, পুলিশ বিশেষভাবে কোনও মৃতদেহ নিয়ে তদন্ত করে না, লাশগুলিকে গাদায় ফেলে শ্মশানে বা গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়, এ ক্ষেত্রেও হয়তো এর বেশি আর কিছুই হবে না। সুন্দরবাবু, এই খুনি বা খুনিরা অত্যন্ত সুচতুর, তাই

জয়ন্তের কথা শেষ হতে না হতেই খানিক তফাতে উঠল বিষম গণ্ডগোল। দলে দলে লোক চারিদিকে প্রাণপণে ছুটোছুটি করে পালাতে লাগল পাগলের মতো। আবার আর একদল লোক লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করতে করতে বেগে ধাবমান হল একদিকে।

সুন্দরবাবু তার রিভলভার বার করে বললেন, এসো জয়ন্ত, এসো মানিক, ব্যাপারটা কী দেখা যাক! এই সেপাইরা, তোমরাও এসো।

কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, ব্যাপারটা কিছুই নয়। দুটো ষাঁড় লড়াই করছে, তাই দেখে কয়েকজন ছুটে নিরাপদ ব্যবধানে সরে আসবার চেষ্টা করেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপথের বিপুল জনতা অকারণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই মিথ্যা বিভীষিকা।

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু আবার ফিরে এলেন যথাস্থানে।

মানিক সবিস্ময়ে বলল, একী! বরেনবাবুর মৃতদেহ কোথায়?

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, তোমার প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা।

খুনিরা এইখানেই হাজির ছিল, তাদের হিসাব ভুল হয়েছে দেখে প্রথম সুযোগেই লাশ তারা সরিয়ে ফেলেছে।

.

তিন। জিপ গাড়ি

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, দুমিনিট পিছু ফিরতে না ফিরতেই সদর রাস্তা থেকে লাশ লোপাট। এমন আজব ব্যাপার আমি তো আর কখনও দেখিনি বাবা!

মানিক বললে, আমরা যখন বরেনবাবুর মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলুম, তখন সেখানে বেশ একটি ছোটখাটো জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। লাশ যারা সরিয়েছে তারা সেই জনতার ভিতরেই ছিল বলে সন্দেহ হচ্ছে।

জয়ন্ত বললে সন্দেহ নয় মানিক, এইটেই হয়েছে সত্য। আচ্ছা, তুমি কি সেই ভিড়টা লক্ষ করেছিলে?

না। বন্ধুর মৃতদেহ দেখে আমি এতটা অভিভূত হয়েছিলুম যে অন্য কিছু লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

আমি কিন্তু লক্ষ করেছিলুম। ভিড়ের ভিতরে ছিল তিনজন কালো চশমা পরা লোক।

সুন্দরবাবু বললেন, আরে হুম! কালো চশমা-পরা লোক দেখলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কথার কোনওই মানে হয় না। এই তো আমি এখন কালো চশমা পরে আছি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও আমি হচ্ছি সন্দেহজনক ব্যক্তি!

মানিক ভুরু নাচিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি ঠিক ওই কথাই বলতে চাই।

–মানে!

পুলিশের লোক বললেই বুঝতে হবে পয়লা নম্বরের সন্দেহজনক ব্যক্তি।

সুন্দরবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, চোপরাও মানিক, চোপরাও! খামোখা টিপ্পনি কেটে আমাকে চটাবার চেষ্টা কোরো না। বাজে ফাজলামি ভালো নয়, পারো তো কাজের কথা বলো।

জয়ন্ত বললে, আমার সন্দেহের কারণ বলি শুনুন। প্রথমত, কোনও ছোট ভিড়ে একখানা কালো চশমাই যথেষ্ট। কিন্তু একসঙ্গে তিনখানা কালো চশমা কি অল্পবিস্তর অসাধারণ নয়? দ্বিতীয়ত, ওই তিনজন কালো চশমা পরা লোকেরই সাজ ছিল একরকম–খাঁটি সার্ট হাফ প্যান্ট আর বুট জুতো, দেখলেই মনে হয় যেন তারা ফৌজের সেপাই। এটাও আমি লক্ষ করেছিলুম যে, তাদের একজন হচ্ছে, অতিরিক্ত ঢ্যাঙা আর অতিরিক্ত রোগা। তার মাথার চুল বেশ লম্বা, প্রায় কাধ পর্যন্ত এসে পড়েছিল।

মানিক চমৎকৃতভাবে বললে, শবদেহ পরীক্ষা করতে করতেও তুমি এত ব্যাপার লক্ষ করেছিল? তাকে দেখলে আবার চিনতে পারবে?

–নিশ্চয়ই পারব! তুমি কি জানো না মানিক, সত্যিকার গোয়েন্দাদের থাকে সেইরকম চক্ষু ইংরেজিতে যা ক্যামেরা আই নামে বিখ্যাত? এরকম চোখে পড়ে যে কোনও দৃশ্য, তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

সুন্দরবাবু বিরক্তিভরে ভূ-সঙ্কোচ করে বললেন, ওসব চোখ-টোখের কথা এখন থো করো বাপু! আমার কথা হচ্ছে, এই অদ্ভুত লাশ চুরির অর্থটা কী?

জয়ন্ত বললে–অর্থ খুবই স্পষ্ট। অপরাধীরা ভেবেছিল এই ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক খুনের মামলা বলে চালিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায় তা দেখবার জন্যে তারা এখানে অপেক্ষা করছিল। তারা দেখল, আমি তাদের অতিচালাকি ধরে ফেলেছি। সুতরাং লাশ যে শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠানো হবে আর পুলিশ যে শবব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্ট পেয়ে মামলার ভার গ্রহণ করবে, এটা বুঝতেও তাদের বিলম্ব হয়নি।

–শবব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্টে কী থাকত?

–ঠিক কী থাকত তা আমি বলতে পারি না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই জানা যেত যে বরেন্দ্রবাবুকে আগে বিষ খাইয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে হত্যা করে পরে তার মৃতদেহের ওপরে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে।

মানিক বললে, কিন্তু একটা গোটা মৃতদেহ হজম করা তো সহজ নয়।

জয়ন্ত বললে, এই দাঙ্গার বাজারে সবই সহজ। কিন্তু আপাতত ও সব কথা থাক। এখন দেখা যাক কী উপায়ে লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেটা জানতে পারা যায় কি না!

তখনও সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল যে ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্যে রাজপথে যখন মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একখানা জিপগাড়ি এসে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। খবরটা যে দিলে, সেই রাস্তার ধারে তার একখানা পানের দোকান আছে।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কীরকম লোক হে বাপু? ও-সব দেখেও চুপ করে রইলে?

দোকানদার বললে, কেমন করে বুঝব হুজুর? আমি ভেবেছিলুম তারা সেপাই।

–তাদের পরনে সেপাইয়ের পোশাক ছিল?

–হ্যাঁ হুজুর!

তারা কজন ছিল?

–তিনজন।

জয়ন্ত শুধোলে, তাদের চোখে কি কালো চশমা ছিল?

–হ্যাঁ হুজুর।

একটা লোক খুব ঢ্যাঙা আর খুব রোগা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর তার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।

জয়ন্ত ও মানিক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি জিপগাড়িখানার নম্বর দেখেছ? দেখোনি? তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গাধা।

–আজ্ঞে, আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।

–পারো না, তাহলে তুমি যে-সে গাধা নও, একটি আস্ত মুখ্যু গাধা।

লোকটি হাতজোড় করে বললে, আজ্ঞে, হুজুর যা বলেন।

জয়ন্ত বললে, জিপগাড়িখানা কোন দিকে গিয়েছে সেটা বলতে পারবে তো।

–আজ্ঞে, সামনের ওই রাস্তা ধরে।

–মানিক, ওটা তো গঙ্গায় যাবার রাস্তা।

হ্যাঁ।

–তা হলে আমার বিশ্বাস লাশটা তারা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবে। শিগগির চলো।

–কোথায়?

–গঙ্গার ধারে।

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর আমার হাতে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তারা এখনও গঙ্গার ধারে বসে আছে?

বসে থাক না থাক, ওদিকে একবার যেতে দোষটা কী?

মানিক অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, জয়ন্ত, জয়ন্ত। গঙ্গার দিক থেকে একখানা জিপগাড়ি খুব বেগে এই দিকেই আসছে না?

হুঁ! আরে আরে, গাড়ির ভিতরে বসে আছে যে আমাদের সেই কালো-চশমা পরা বন্ধু লোকেরাই। বাহবা কি বাহবা!

.

চার। অগ্নিশিখার নাচ

সুন্দরবাবু চারজন পাহারাওয়ালা নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেল জয়ন্ত ও মানিক।

জিপগাড়িখানা কোনওরকম ইতস্তত না করেই ছুটে আসতে লাগল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যেও কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। নির্ভয়ে তারা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো।তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, পথজোড়া এই জনতা যেন তাদের দৃষ্টিগোচরই হয়নি।

গাড়ি খুব কাছে এসে পড়তেই, সুন্দরবাবু দুই বাহু শূন্যে তুলে হুকুমের স্বরে বললেন, গাড়ি থামাও। গাড়ি থামাও।

কোনওরকম জানান না দিয়েই গাড়ির গতি বেড়ে গেল আচম্বিতে। পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনকে হার মানিয়ে গাড়িখানা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ভোঁ-দৌড় মারলে যে সুন্দরবাবু প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পিছনদিকে মস্ত এক লম্ফ ত্যাগ করে নিজের বিপুল উঁড়ির ভারে টাল খেয়ে দড়াম করে হলেন প্রপাত ধরণীতলে। জয়ন্ত, মানিক ও অন্যান্য লোকেরাও কোনও-গতিকে গাড়িচাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল এ যাত্রা।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রিভলভার বার করে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল এবং সেই উল্কাগতিতে ধাবমান জিপগাড়ি টায়ার লক্ষ্য করে বারকয়েক গুলি ছুড়লে।

কিন্তু জিপখানা এর মধ্যেই রিভলভারের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে, এবং পরমুহূর্তেই মোড় ফিরে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

মানিক বললে, আমি কিন্তু গাড়িটার নম্বর দেখে নিয়েছি।

জয়ন্ত বললে, নম্বর হয়তো কোনও কাজেই লাগবে না। খুব সম্ভব ওরা আসল নম্বর ব্যবহার করেনি।

সুন্দরবাবু তখন উঠে পথের উপরেই দুই পা ছড়িয়ে বসে আছেন। কাতর মুখে তিনি মাথার পিছন দিকটায় হাত বুলিয়ে হাতখানা চোখের সামনে ধরে করুণ স্বরে বললেন, ভেবেছিলাম মাথাটা ফেটে গিয়েছে, এখন দেখছি ফাটেওনি, রক্তও পড়ছে না! হুম!

মানিক বললে, সুন্দরবাবু আপনার পক্ষে মাথার চেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে, আপনার স্ফীতোদরটি। মাথা ফাটলেও আপনি পটল তুলবেন না, কিন্তু ভুড়ি ফেঁসে গেলে একেবারেই সর্বনাশ! দেখুন দেখুন, সর্বাগ্রে ভুড়িটা পরীক্ষা করে দেখুন।

চেষ্টা করে রাগ সামলে সুন্দরবাবু বললেন, থামো হে ফাজিল, থামো! আমার ভুড়ির ভাবনা ভেবে তোমাকে আর মস্তক ব্যথিত করতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও।

মানিক বললে, চরকা? আমার চরকা নেই। আমি গান্ধিজিকে মানি বটে, কিন্তু তার চরকা মানি না।

হুম তা মানবে কেন? তোমরা আজকালকার ছেলেরা যে কমিউনিস্ট!

কমিউনিস্ট কাদের বলে সুন্দরবাবু? আমাদের নেতাদের বক্তৃতা শুনলে সন্দেহ হয়, আগেকার টেররিস্টরাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট। এ কথা কি সত্য!

–যাও ছোকরা যাও! মরছি নিজের গায়ের ব্যথায়, এখন উনি এলেন কিনা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে। বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, মানিক বাজে কথা ছাড়ো! আমার কথার জবাব দাও। তুমি বরেনবাবুর বাড়ি চেনো?

নিশ্চয় চিনি, তিনি যে আমার বন্ধু। চন্দ্রকান্ত রোডে জায়গা কিনে তিনি নতুন একখানা বাড়ি তৈরি করছিলেন। বাড়িখানার কেবল একতলাই বাসযোগ্য হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে মালপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে দোতলা আর তেতলা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বরেনবাবু আপাতত একতলাতেই বাস করতেন।

তার পরিবারবর্গ আছেন?

–আছেন বইকী! কিন্তু অসম্পূর্ণ বাড়িতে স্থানাভাব বলে তারা এখন দেশে আছেন।

–তাহলে কলকাতার এই বাড়িতে বরেনবাবু একাই থাকতেন।

–না, ঠিক একলা নয়। ঠিকে ঝি আর পাঁচক কাজকর্ম সেরে চলে যেত, বাড়িতে সর্বদাই থাকত নিধিরাম। সে বরেনবাবুর পুরোনো বেয়ারা। খুব বিশ্বাসী।

বরেনবাবু কি বেশ বড় জমিদার? –

-খুব বড় নন, খুব ছোটও নন, মাঝারি।

তাঁর আয় কত জানো?

–ঠিক জানি না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, তার মাসিক আয় বোধহয় হাজার ছয় টাকার কম ছিল না।

জয়ন্ত মিনিটখানেক একেবারে চুপ। তারপর বললে, আচ্ছা, বরেনবাবুর সম্বন্ধে বাকি কথা পরে জানলেও চলবে। আপাতত আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমাকে বরেনবাবুর বাড়িতে নিয়ে চলো। সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি?

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, আছাড় খেয়ে বেদম হয়ে পড়েছি। এটা আমার মামলা নয়, যাবার খুব ইচ্ছা নেই। তবে তুমি যখন বলছ–

সকলে পা চালিয়ে দিলে। সেখান থেকে চন্দ্রকান্ত রোড বেশি দুর নয়–

বরেনবাবুর নবনির্মিত অসম্পূর্ণ বাড়ি। একতলার কোনও কাজ বাকি নেই–এমনকী শার্সি-খড়খড়িতে রং পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। দ্বিতলে ইট-চুন-সুরকির কাজ শেষ হয়েছে বটে, তবে রঙের মিস্ত্রি এখনও সেখানে হস্তাপণ করেনি। কিন্তু ত্রিতলের অধিকাংশ কাজই অসমাপ্ত। বাড়ির সুমুখে নীচে থেকে ত্রিতল পর্যন্ত দাঁড় করানো রয়েছে বাঁশের ভারা।

সমস্তটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, দেখছি বাড়িখানা এখনও অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ওই ভারা বেয়ে বাইরের যে-কোনও লোক বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারে। এমন বাড়িতে বাস করা উচিত নয়।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মানিক হাঁকলে, নিধিরাম। অনিধিরাম!

একজন মাঝবয়সি লোক বাইরে এসে দাঁড়াল। রং প্রায় কালো, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, খালি গা খালি পা। কিন্তু তার মুখের ভাব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মানিককে দেখেই সে ব্যগ্রভাবে বললে, মানিকবাবু এসেছেন? আপনি বলতে পারেন, আমাদের বাবু কোথায় আছেন?

মানিক বললে, ব্যস্ত হোয়ো না নিধিরাম, সব কথা পরে বলছি। আগে তুমি সব কথা বলো দেখি।

নিধিরাম প্রথমে পাহারাওলাদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর বললে, কাল রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবু তার ঘরের ভিতরে শুতে যান, আমিও খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর আজ ভোরে উঠে এসে দেখি, বাবুর ঘরের দরজা খোলা, বাবুও ঘরের ভিতরে নেই। বাবু তো বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, আজ এত সকালে তার ঘুম ভেঙেছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সদর দরজাটাও ভোলা দেখে বুঝলুম, নিশ্চয়ই তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মানিকবাবু, এখন বেলা

বারোটা বেজে গিয়েছে, এখনও বাবু বাড়িতে ফিরে আসেননি। আপনি কি বাবুর খবর জানেন? আপনার সঙ্গে পুলিশ কেন? বাবু কি কোনও বিপদে পড়েছেন?

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে বললে, সেসব কথা পরে হবে নিধিরাম। এখন বাবুর শোবার ঘরে আমাদের নিয়ে চলো দেখি।

নিধিরাম রাস্তার ধারের একখানা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, বাড়ির ওপরটা তো এখনও তৈরি হয়নি, বাবু তাই ওই বৈঠকখানাতেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দেন।

–বেশ, তাহলে ওই ঘরখানাই আমরা দেখতে চাই।

নিধিরামের পিছনে-পিছনে সকলে সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানায় ভিতরে প্রবেশ করলে।

বেশ বড়সড় ঘর। মেঝের ওপরে কার্পেট পাতা। দিকে দিকে টেবিল, চেয়ার, সোফা কৌচ। দুটো কেতাবের আলমারি। দুদিকের দেয়ালের গায়ে দুখানা ফ্রেমে বাঁধানো বড় আয়না। ঘরের এক কোণে একখানা ক্যাম্পখাট পাতা।

জয়ন্ত শুধোলে, তোমার বাবু কি খাটেই শুতেন?

নিধিরাম বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেই দিকে।

অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে ঘরের ভিতর দুম করে একটা অদ্ভুত শব্দ হল এবং সঙ্গে-সঙ্গে এখানে-ওখানে দেখা গেল অভাবিত অগ্নিশিখার আরক্ত নৃত্য।

.

পাঁচ। গ্যাসোলিন

প্রথমেই দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। তার পিছনে নিধিরাম এবং তার পিছনে একসঙ্গে সুন্দরবাবু ও মানিক।

বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত তার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা প্রায় একসঙ্গেই তাদের তিনজনকে মারলে এমন প্রচণ্ড ধাক্কা যে ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে ঠিকরে তারা হুড়মুড় করে একেবারে বাইরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

পড়তে-পড়তেই মানিকের সচকিত দৃষ্টি দেখলে, তার পাশে শূন্যপথে এসে হাজির হল জয়ন্তর দেহও।

মাটিতে পড়েই জয়ন্ত ও মানিক আবার দাঁড়িয়ে উঠল চোখের নিমেষে।

বরেনবাবুর বৈঠকখানায় ভিতরটা তখন পরিণত হয়েছে একটা বিশাল চুল্লিতে। হু-হু রাঙা আগুন এবং কালো কুচকুচে ধোঁয়া ঘরের ভিতরটা একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং দরজা জানলার ভিতর দিয়েও বাইরে বেরিয়ে আসছে ক্রুদ্ধ লকলকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা, ধোঁয়াকুণ্ডলীর পর ধোঁয়াকুণ্ডলী। চারিদিকে এমনি ভীষণ উত্তাপ যে, সেই ভয়াবহ অগ্নিগৃহের বাইরে থেকেও সকলের দেহ যেন পুড়ে ঝলসে যাবার মতো।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! শিগগির বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চলুন।

তখনও ভূতলশায়ী সুন্দরবাবু দুই একবার ওঠবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, কোমর ভেঙে গিয়েছে আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে। আমি আর উঠতে পারছি না যে!

জয়ন্ত ও মানিক তখন সুন্দরবাবুকে চ্যাংদোলা করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। নিধিরাম এর মধ্যেই পালিয়ে রাস্তায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, মানিক, দৌড়ে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেড-কে ফোন করে দাও।

দেখতে-দেখতে রাস্তায় জমে উঠল প্রকাণ্ড জনতা। এমন হইচই শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দায়। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি। সকলের ইচ্ছা আরও কাছে আসে, কিন্তু আগুনের তাতে আরও কাছে আসা অসম্ভব।

ফোন করে এসে মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ভাই জয়ন্ত, ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।

–প্রথমে আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। তবে অগ্নিকাণ্ডের এক মুহূর্ত আগেই আমার সজাগ চোখ দেখেছিল একটা দৃশ্য, আর আমার সজাগ কান শুনেছিল একটা শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও সাবধান হতে পেরেছিলুম, নইলে এতক্ষণে আমরা কেউই প্রাণে বাঁচতুম না।

–আমি দেখতে কিছুই পাইনি। তবে একটা শব্দ শুনেছিলুম বটে।

কীরকম শব্দ?

কাচের কোনও জিনিস ভাঙার শব্দ?

–ঠিক। কিন্তু তুমি কিছুই দেখতে পাওনি, না মানিক? এতেই বোঝা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকেও তুমি এখনও পুরোপুরি গোয়েন্দা হতে পারোনি। আদর্শ গোয়েন্দার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সর্বদিকে পঞ্চেন্দ্রিয়কে সতর্ক বা জাগ্রত রাখা। আমি কি দেখেছিলুম জানো?

বল।

অতর্কিতে একটা মূর্তি দরজার সামনে আবির্ভূত হল–সেই কালো চশমা আর খাকি পোশাক পরা মূর্তি। পরমুহূর্তে সে একটা কাচের জাগ সজোরে ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করলে– জাগটার মুখের কাছটা জ্বলন্ত।

জ্বলন্ত কাচের জাগ?

–হ্যাঁ। আচ্ছা মানিক, তুমি কোনও গন্ধ পাওনি?

–গন্ধ পাবার সময় দিলে কই? যে হাড়ভাঙা ধাক্কা মেরেছিলে।

ধাক্কা না মারলে তোমরা যে বাঁচতে না ভাই।

কিন্তু গন্ধের কথা কী বলছ?

–আমি একটা গন্ধ পেয়েছি। গ্যাসোলিনের গন্ধ।

মানিক কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে পড়ল। বরেন্দ্রবাবুর বাড়ি তখন জ্বলছে দাউদাউদাউ। শত-শত অগ্নিশিখা তখন রক্ত-সর্পের মতো সোঁ সোঁ করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, যেন আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে।

জয়ন্ত ডাকলে, সুন্দরবাবু!

–হুম!

এখন আপনার অবস্থা কেমন?

–প্রায় মারাত্মক। কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু শরীরে আর পদার্থ নেই। একটিমাত্র দিনে দুই-দুইবার প্রচণ্ড আছাড় খাওয়া। এই বয়সে হজম করতে পারব কেন ভায়া?

–এ বাড়ির ভিতর থেকে কোনওরকম সূত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই–অগ্নিদেব সমস্তই নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বেন না। ফায়ার ব্রিগেডের কাজের অসুবিধে হবে, আমরা খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেই ভালো হয়।

ভিড় ঠেলে তারা অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, কাচের জ্বলন্ত জাগ, গ্যাসোলিন, এ সব কী বলছ জয়ন্ত, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

আমরা সাংঘাতিক শত্রুর পাল্লায় পড়েছি, তারা পদে পদে আমাদের অনুসরণ করছে। আসল ঘটনাস্থলে আমাদের আবির্ভাব দেখেই তারা কেবল ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়নি, আমাদেরও পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কাচের জাগ আর গ্যাসোলিনের গুপ্ত কথাটা কী?

মনে করুন, আপনি একটা কাচের জাগের ভিতরটা গ্যাসোলিনে ভর্তি করলেন। তারপর খালি ন্যাকড়া দিয়ে জাগের মুখটা বন্ধ করলেন। ন্যাকড়ার কতক অংশ পলতের মতো বাইরে বের করে রেখে তাতেও ঢেলে দিলেন গ্যাসোলিন। তখন কাচের জাগটা পরিণত হল মারাত্মক বোমায়।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, বোমায়!

–ঠিক তাই।

তারপর?

–এ বোমা যে ব্যবহার করবে তাকেও রীতিমতো হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। পলিতার অগ্নিসংযোগ করবার পর সময় পাওয়া যাবে মাত্র দুই সেকেন্ড। তার মধ্যে জাগটা নিক্ষেপ করতে না পারলে নিক্ষেপকারীরও বিপদের সম্ভাবনা।

–হুম! এমন বিটকেল বোমার কথা তো জীবনে কখনও শুনিনি!

–শোনা উচিত ছিল। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে এইরকম বোমাই ব্যবহার করত। আমি ভাবছি, আমাদের মারবার জন্যে যে লোকটা জাগ ছুঁড়েছে, তার কোনও ক্ষতি হয়েছে কিনা।

ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে জয়ন্তের কথা শুনছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, মশাই ঠিক অনুমান করেছেন। একটু আগে একজন কালো চশমা আর খাকি পোশাক পরা লোক পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে পথের ওপরে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়, তার সমস্ত পোশাকে আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা কয়জন মিলে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু সে বাঁচবে বলে মনে হয় না। লোকটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেইখান থেকে এই ভাঙা চশমা আর একখানা চশমার খাপ কুড়িয়ে পেয়েছি।

ক্ষিপ্রহস্তে জিনিস দুটো গ্রহণ করে জয়ন্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, তাকে কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জানেন?

–জানি, মেয়ো।

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন। আর এক মিনিট দেরি নয়, এখনি মেয়ে হাসপাতলে ছুটতে হবে।

সুন্দরবাবু বললেন, বাপরে বাপ, আজ আমার সব দম বেরিয়ে যাবে দেখছি। ঘটনার পর ঘটনা–এ যে ঘটনার মহাবন্যা!

.

ছয়। রামবাবুর লেন

গঙ্গার ধারে মেয়ে হাসপাতাল। প্রবেশপথ স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর।

জয়ন্ত হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করল সদলবলে। সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নতুন বিস্ময়!

আগুনে পোড়া কোনও লোককে নিয়ে সেদিন কেউ হাসপাতালে আসেনি।

বোকার মতন মাথা চুলকোতে লাগল জয়ন্ত। কোনও হদিস খুঁজে না পেয়ে আর সকলেও অবাক।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

প্রথমেই মুখ খুলল মানিকের। সে বললে, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? অপরাধীর সঙ্গীরাও ছিল জনতার ভিতরে। তারাই আগুনে-পোড়া লোকটাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে গাড়িতে উঠে চম্পট দিয়েছে। নইলে একটা মরো-মরো মানুষ এমনভাবে হঠাৎ উবে যেতে পারে না।

জয়ন্ত বললে, আমারও মনে হচ্ছে, মানিকের অনুমান সত্য! সুন্দরবাবু, যারা বরেনবাবুকে খুন করেছে, তারা সাধারণ অপরাধী নয়। এমন করে বার বার আমাদের চোখে ধুলো দেবার শক্তি যার-তার হয় না। এ মামলাটার কিনারা করতে হলে আমাদের অনেক কাঠ-খড়ই পোড়াতে হবে দেখছি।

সুন্দরবাবু বললেন, কাঠই বলো আর খড়ই বলো, আজকে আমি আর কোনওকিছুই পোড়াতে রাজি নই বাবা! আমার গোটা দেহটাই পাকা ফোঁড়ার মতন টনটন করছে, এই আমি সবেগে ধাবমান হলুম নিজের বাসার দিকে। এখন সামনে চিনের প্রাচীর থাকলেও আমার গতিরোধ করতে পারবে না।

জয়ন্ত বললে, একটু দাঁড়ান সুন্দরবাবু, একটা কথা।

–এখনও কথা? সকাল থেকে এত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা কয়েও তোমার আশ মিটল না, আরও একটা কথা আছে? কী কথা বলো?

কলকাতার শ্মশান আছে তিনটে কাশী মিত্রের ঘাট, নিমতলা আর কেওড়াতলা।

–এটা তোমার আবিষ্কার নয়, একথা সবাই জানে।

–শুনেছেন তো, যে লোকটা আজ আগুনে পুড়েছে তার বাঁচবার সম্ভাবনা কম? যদি সে মারা পড়ে তার দেহ যে-কোনও একটা শ্মশানে নিয়ে যেতে পারে। ওই তিনটে শ্মশানে পাহারার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

–হুম, দেখা যাবে। আর কোনও কথা নেই তো? আর কোনও কথাই আমি শুনব না কিন্তু!

না সুন্দরবাবু, আপাততত আমার কথা ফুরোল।

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির পথ ধরলে।

সেইদিনেই বৈকালের পর। জয়ন্তের বাড়ির একটি ঘর।

চায়ের পেয়ালা খালি করে জয়ন্ত বলল, মানিক, এবারের মামলাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

-কেন?

কারণ প্রথমত, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সূত্রই আবিষ্কার করার সুযোগ আমরা পাইনি। দ্বিতীয়ত, কোন উদ্দেশ্যে বরেনবাবুকে খুন করা হয়েছে? তুমি কি তার কোনও শত্রুর কথা জানো?

না।

উদ্দেশ্যহীন হত্যা করে কেবল পাগল।

–কিন্তু আজ আমরা যাদের পাল্লায় পড়েছিলুম, তারা যে পাগল নয়, সে পরিচয় পেয়েছি পদে-পদে।

না, পাগল নয়। তারা অতি সুচতুর ব্যক্তি। কিন্তু কেন তারা বরেনবাবুকে খুন করল?

–আমি কেমন করে বলব?

–তুমি বরেনবাবুর পরিবারবর্গের কথা বলছিলে। তাদের কথা আরও ভালো করে বলো।

বরেনবাবুর দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার তিনি বিবাহ করেন, তার কোনও স্ত্রীরই সন্তান হয়নি।

–মানিক, বরেনবাবুর মাসিক আয় ছিল ছয় হাজার?

হ্যাঁ।

–অর্থাৎ বাৎসরিক বাহাত্তর হাজার টাকা। বড় সামান্য টাকা নয়। এর চেয়ে ঢের কম টাকার জন্যে পৃথিবীতে অনেক নরহত্যা আর রক্তপাত হয়েছে।

মানিক সচমকে বললে, তুমি কি মনে করো, সম্পত্তির লোভেই কেউ বরেনবাবুকে খুন করেছে?

–আপাতত আমি কিছুই মনে করি না। গোড়া থেকেই অন্ধের মতো যে-কোনও একটা সন্দেহের পিছনে ছুটোছুটি করা আমার স্বভাব নয়। এখন আমার মন হচ্ছে নতুন খাতার মতো, যার ওপরে সন্দেহজনক একটি লাইনও লেখা হয়নি। যাক সেকথা। বলো দেখি মানিক, বরেনবাবুর অবর্তমানে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?

–খুব সম্ভব তার ছোট ভাই।

বরেনবাবুর আর কোনও আত্মীয় নেই?

–আছেন। দুই বোন! একজন সধবা, একজন বিধবা। তারা দুজনেই থাকেন শ্বশুরবাড়িতে।

বরেনবাবুর ছোট ভাইয়ের নাম কী?

নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বরেনবাবুর পৈতৃক সম্পত্তির বাকি অর্ধাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও পেয়েছিলেন।

নরেনবাবুর বয়স কত?

–ত্রিশের বেশি হবে না।

–স্বভাব চরিত্র?

–যতদূর জানি, আর সব দিক দিয়েই ভালোই। অত্যন্ত সরল, সজ্জন, নম্র, বিনয়ী, পরোপকারী। কিন্তু

–থামলে কেন? কিন্তু কী?

ভীষণ তার ঘোড়দৌড়ের নেশা। অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি খুইয়েছেন ঘোড়ার পিছনেই। আগে তার নিজেরও রেসের ঘোড়া ছিল।

–আমি বরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

–তিনি এখন দেশে আছেন।

দাদার মৃত্যুর খবর পেলেই নিশ্চয় তিনি কলকাতায় আসবেন।

–হ্যাঁ। তাঁদের দু-ভায়ের ভিতর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। দুজনেই দুজনকে ভালবাসতেন।

–আজ থাক এ প্রসঙ্গ। এখন অন্য একটা দরকারি কথা শোনো।

বলো।

–যে লোকটা কাচের জুলন্ত জাগ ছুঁড়েছিল। তার ভাঙা চশমা আর চশমার খাপখানা আমার হস্তগত হয়েছে, জানো তো? চশমার খাপের ভিতরে একটুকরো চিঠি পেয়েছি, এই নাও, তুমিও পড়ে দ্যাখো।

কাগজের ভাঁজ খুলে মানিক পড়লেঃ

বিজয়, আজ রাত ১০টার সময়ে ১০ নম্বর রামবাবুর লেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না।

মানিক শুধোলে, রামবাবুর লেন কোথায়?

–বেহালায়। চিঠির তারিখ দেখেছ? বিজয়ের আজই রামবাবুর লেনে যাবার কথা।

–চিঠি যে লিখেছে তার নাম নেই।

–নামটা আমাদেরই আজ আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ বিজয় এখন কুপোকাত, সুতরাং তার বদলে আমরা দুজনে আজ সন্ধ্যার পরেই রামবাবুর লেনে যাত্রা করব। কেমন রাজি?

–নিশ্চয়। কিন্তু হুঁশিয়ার। সঙ্গে রিভলভার আনতে ভুলো না যেন।

.

সাত । দশ নম্বর বাড়ি

সন্ধ্যা এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষের একটি রাত। প্রথম দিকে খানিকটা ভাঙা চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু তারপরেই পৃথিবী ছেয়ে গেল অন্ধকারে। জয়ন্ত কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করলে রামবাবুর লেনের দশ নম্বরকে।

খুব সম্ভব সেটা কোনও বাগানবাড়ি। চারিদিকে প্রাচীর, ফটকের রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, গাছপালার মাঝখানে একখানা বড় একতলা বাড়ি। কিন্তু ফটকে বাহির থেকে তালা দেওয়া। বাড়ির কোনও দরজা জানালার ফাঁক দিয়েও চোখে পড়ে না এতটুকু আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, দেখে মনে হচ্ছে বাড়িখানা খালি। এখনও তো দশটা বাজতে অনেক দেরি, আপাতত আমাদের কী করা উচিত, মানিক?

–হয় পাঁচিল টপকে ভিতরে যাওয়া, নয় রাস্তার ওপাশের গাছে চড়ে ওপর থেকে চারিদিকে নজর রাখা।

–উত্তম। আমরা শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করব। এসো ভায়া, খানিকক্ষণ শাখামৃগের ভূমিকায় অভিনয় করা যাক। খানিকক্ষণ কাটল, দ্রুতবেগে অস্ত যাবার চেষ্টা করছে আজকের অনতি-উজ্জ্বল চাঁদ।

জয়ন্ত বললে, বাঁদরগুলো আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে না বটে, কিন্তু মশার দল কেমন সানন্দে ব্যান্ড বাজিয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দ্যাখো।

মানিক নিজের ওপরে ঘন ঘন চপেটাঘাত করে মশকদের অভ্যর্থনার উত্তর দিতে দিতে বললে, এ-সময়ে সুন্দরবাবুর অভাব অনুভব করছি। এখানে তিনি এখন থাকলে এই সব অনাহূত মশকের উদ্দেশে যেসব চোখা চোখা বচন ঝাড়তেন, কোনও অভিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যেত না।

আরও কিছুক্ষণ গেল। নিচের রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে লোকজন যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের কেউ সেই দশ নম্বরের বাগানের দিকে ফিরেও তাকালে না। বেজে গেল রাত দশটা, চাঁদ গেল অস্ত। পৃথিবীর নাট্যশালায় নিরন্ধ্র অন্ধকারের প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, অন্ধকার আজ আমাদের চোখ অন্ধ করতে পারবে না। বাগানবাড়ির ফটকের পাশেই একটা সরকারি আলো রয়েছে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে কারুর পক্ষেই ফটকের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে না।

মানিক বললে, কিন্তু কেউ কি আজ ওই ফটক খুলতে আসবে? আমার মনে হয় বিজয়ের দুর্ঘটনার জন্যে আজ ওদের আড্ডা আর বসবে না।

–তা অসম্ভব নয়। তবু আরও কিছুক্ষণ পাহারা দেওয়া যাক।

রাত এগারোটা বাজল।

মানিক বললে, ভাই জয়ন্ত, আর নয়। খামোকা মশাদের রক্ত-তৃষ্ণা নিবারণ করে লাভ নেই। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হওয়া যাক।

–তথাস্তু, কিন্তু বাগানের ভিতরটায় একবার চোখ না বুলিয়ে এ স্থান আমি ত্যাগ করব না। গাছ থেকে নামতে-নামতে বললে জয়ন্ত।

রাস্তায় আর পথিকদের পদশব্দ নেই। বোবা ও অন্ধরাতে কালো চাদরে গা-ঢাকা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করছে খালি পাচার দল। বাদুড়দের ডানা-নাড়াও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

জয়ন্ত ও মানিক হাজির হল প্রাচীরের ওপারে, বাগানের ভিতরে।

অন্ধকারে ছায়ার মতন খানিকক্ষণ এদিক-ওদিকে ঘুরে জয়ন্ত বলল, এত বড় বাগান, এত বড় বাড়ি এমন খালি পড়ে থাকা স্বাভাবিক নয়। মালির ঘর পর্যন্ত বাহির থেকে তালা বন্ধ। এ যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। এসো মানিক, একবার বাড়ির ভিতরটা পরীক্ষা করা

দালান পার হয়েই সামনে যে দরজাটা পাওয়া গেল তা কুলুপ আঁটা ছিল না। জয়ন্ত ও মানিক ভিতরে প্রবেশ করে টর্চের আলোতে দেখলে, সেটা হচ্ছে হল-ঘরের মতো। বেশ সাজানো-গোছানো। বড় বড় ছবি, আর্শি, মার্বেলের টেবিল, সোফা কৌচ, শ্বেতপাথরের মূর্তি। একদিকে ঢালা-বিছানা পাতা, তার ওপরে তাকিয়ার ভিড়।

জয়ন্ত বললে, এ ঘর ব্যবহার করা হয়, দরজা পর্যন্ত খোলা, অথচ বাড়িতে মানুষ নেই। সন্দেহজনক! রিভলভার বার করো মানিক, রিভলভার বার করো! বাড়ির অন্য ঘরগুলো সাবধানে দেখতে হবে। টর্চের আলো নিবিয়ে তারা অগ্রসর হল বাইরের দিকে।

আচম্বিতে সেই অন্ধকারে কোথা থেকে কেমন করে অনেকগুলো মূর্তি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়ন্ত ও মানিকের উপরে। এত হঠাৎ এই অভাবিত ঘটনাটা ঘটল যে, তারা বাধা দেবার বা একখানা হাত তোলবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না।

তারপর শোনা গেল এক অর্ধ-কর্কশ এবং অর্ধ-কোমল আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। একজন মানুষের গলা দিয়ে একসঙ্গেই কথা কইছে যেন দুইজন মানুষ।

–বেঁধে ফ্যালো, ওদের দুজনেরই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যালো।

কে বললে, বড় অন্ধকার যে! আলো জ্বালবো নাকি?

না, না, খবরদার! আমাদের শ্রীমুখগুলো দর্শনের সৌভাগ্য ওদের আমি দিতে রাজি নই।

একটু পরেই তো ওদের প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবে। এখন আর ওদের ভয় করবার দরকার কী?

–ভয়! আমি কি ভয় পাবার ছেলে? ভয় নয় রে ভয় নয়, এ হচ্ছে সাবধানতা। জানিস তো, সাবধানের মার নেই!

জয়ন্ত ও মানিকের হাতে পড়ল কঠিন বাঁধন। কারা তাদের টর্চ আর রিভলভার কেড়ে নিলে।

সেই উদ্ভট কণ্ঠস্বর বললে, শোনো মহা-গোয়েন্দা জয়ন্ত! ঘরের ভিতরে আমরা আছি দশজন লোক, আর আমাদের চারজনের হাতে আছে গুলিভরা রিভলভার। তোমরা যদি চেঁচাবার চেষ্টা করো, তাহলে সেই চিৎকার হবে তোমাদের এ-জীবনের সর্বশেষ চিৎকার। অতএব বোবা হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকো।

.

আট । 'দূরাগতশব্দানুকরণবিদ্যা'

অর্ধ-কর্কশ ও অর্ধ-কোমল কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করলে, জয়ন্ত, তুমি আমাদের বন্দি করতে চাও?

জয়ন্ত বললে, তুমি হুকুম দিয়েছ আমাদের বোবা হয়ে থাকতে। তবে আবার প্রশ্ন করছ কেন?

–আচ্ছা, নতুন হুকুম দিচ্ছি, তুমি আস্তে-আস্তে কথা কইতে পারো।

কী অনুগ্রহ!

–ব্যঙ্গ রাখো? বলো, তুমি এসেছিলে আমাদের বন্দি করতে?

–তুমি যে-কোনও মহাপুরুষ তা না জেনে কেমন করে বলি তোমাকে আমি বন্দি করতে চাই কি না?

–আত্মপরিচয় দেবার ইচ্ছা আমার নেই।

–তাহলে তোমার প্রশ্নও হয়ে রইল উত্তরহীন।

তবে কি তুমি এখানে এসেছিলে কেবলমাত্র নির্মল বায়ু ভক্ষণ করতে?

–তাও না।

তবে?

সত্য কথা বলব?

–হ্যাঁ। আমি নিজে প্রায়ই সত্য কথা বলি না, কিন্তু আমি সত্য কথা শুনতে ভালোবাসি।

–তোমার কথাগুলো রবি ঠাকুরের কবিতার মতো নয়।

–মানে?

–তুমি ভারি স্পষ্ট ভাষায় কথা কইছ।

-হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট কথা বলতে চাই, আর শুনতে চাই।

সাধু, সাধু!

-আবার ব্যঙ্গ? বলো কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

-তোমার প্রশ্ন যে আর একটা নতুন হুকুমের মতন শোনাচ্ছে?

-হ্যাঁ, তাই। কেন এখানে এসেছিলে?

যদি না বলি?

বধ করব!

-যদি বলি?

-তাহলেও তোমরা বাঁচবে না।

-হরে দরে সেই হাঁটু জল?

-হাঁটু জল নয় বাবা, গভীর জল!

বুঝলুম না।

-তোমাদের হাত-পা বেঁধে, থলেয় পুরে এই বাগানের পুকুরে গভীর জলে নিক্ষেপ করব।

-খাসা। মৃত্যুটা রোমান্টিক হবে বলে মনে হচ্ছে।

-শোনো মহা-গোয়েন্দা জয়ন্ত!

কী হুকুম জনাব?

–তোমরা এখানে কেন এসেছিলে আমার মুখেই শুনবে?

জনাব হাত গুনতে জানেন?

–ওরে হাঁদারাম, আমি হাত গুনতে জানি না। আমি জানি দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

–অপূর্ব আবিষ্কার।

–আবিষ্কার নয়রে, সহজ সত্য।

সত্য কোনও দিনই সহজ নয়।

–তাই নাকি?

–হ্যাঁ। সত্য সহজ হলে খ্রিস্টদেবকে ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হত না।

–তুমি খালি মহা-গোয়েন্দা নও, মহা-দার্শনিকও।

দর্শন–অর্থাৎ ভালো করে দর্শন করাই হচ্ছে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য।

–তাহলে শোনো। আজ সকালে তোমার চর্মচক্ষু যা দর্শন করেছিল, তা ঠিক নয়।

কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

তুমি একখানা চিঠি পড়ে এখানে এসেছ তো?

হ্যাঁ।

–সেই চিঠিতে বিজয় নামে কোনও ব্যক্তিকে এই বাগানবাড়িতে আসতে বলা হয়েছিল?

হুঁ।

–সেই চিঠিখানা লিখেছিলুম আমিই।

তারপর?

–কিন্তু বিজয় নামধারী কোনও ব্যক্তিকেই আমি চিনি না।

বটে!

–ওই চিঠির বিজয় হচ্ছে কাল্পনিক ব্যক্তি।

–এতখানি কল্পনাশক্তি প্রয়োগের কারণ কী?

–আমি তোমাকে ভুলিয়ে এখানে আনতে চেয়েছিলুম।

ভুলিয়ে?

–হ্যাঁ। চিঠিসুদ্ধ চশমার খাপখানা আমরা ইচ্ছে করেই সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলুম। কারণ আমি জানতুম, চিঠিখানা তোমাদের হস্তগত হবেই।

–তোমার কথা শুনে কবি মাইকেলের ভাষায় বলতে সাধ হচ্ছে–তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে। আমাকে এখন গাধা বললেও রাগ করব না।

ফাঁদে পা দিয়েছ। এখন আর আত্মলাঞ্ছনা করে লাভ নেই।

–আমার মতন গাড়লের বেঁচে থাকা উচিত নয়।

–তা তুমি বাঁচবেও না। তুমিও না, তোমার বন্ধুও না।

–কিন্তু তোমার এ আদেশ আমি শিরোধার্য করতে রাজি নই।

–দেখা যাবে। এই সঙ্গে ভুদো সুন্দর-গোয়েন্দাকেও যমালয়ের পথে পাঠাতে পারলে সুখী হতুম। তার ওপরে আমার অনেক দিনের রাগ।

–যাক, তোমার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। সুন্দরবাবুর ওপর তোমার অনেক দিনের রাগ? তাহলে তুমি একজন পুরোনো পাপী, তোমার নাম জানা আর অসম্ভব হবে না।

মূর্খ, নাম জানবার সময় পাবে কখন? তুমি যে কালকের সূর্যোদয় পর্যন্ত দেখতে পাবে না।

–তোমার এ ধারণা ভ্রান্ত।

দু-রকম গলায় শোনা গেল একজনের অট্টহাস্য। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বললে, আমার ধারণা ভ্রান্ত! মরবার ভয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে?

–মরব না আমি, মরবে তুমি।

–আমায় কে মরবে?

সুন্দরবাবু।

–কোথায় সে?

–এইখানে, এই বাগানে।

–আমি কি প্রলাপ শুনছি?

–মোটেই নয়। ওই শোনো সুন্দরবাবুর গলা। তিনি সদলবলে তোমাদের গ্রেপ্তার করতে আসছেন।

কই, আমি কারুর গলা শুনছি না।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু।

দূর থেকে সাড়া এল, যাচ্ছি ভায়া, কোনও ভয় নেই।

সুন্দরবাবু শিগগির আসুন।

আরও কাছ থেকে সাড়া এল–এই যে আমরা এসে পড়েছি।

পর মুহূর্তে দ্রুত পদশব্দ তুলে ঘরের লোকগুলো বাইরে পলায়ন করলে দারুণ আতঙ্কে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, সুন্দরবাবুকে তুমি কখন খবর দিলে?

অন্ধকারে মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, কোথায় সুন্দরবাবু? তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি ভেন্ট্রিলকুইজম জানি? এদেশি ভাষায় তার একটি গালভরা নাম আছে–দূরাগতশব্দানুকরণ বিদ্যা! দেখেছ তো ভায়া, যথাসময়ে সব বিদ্যাই কাজে লাগে!

.

নয়। সুন্দরবাবু নিদ্রাচর নন

জয়ন্তদের চায়ের আসর। তরল পানীয়ের সঙ্গে নিরেট খাবারেরও অভাব নেই, স্যান্ডউইচ নিমকি, ডিম, কেক। জয়ন্ত ও মানিক চায়ের সঙ্গে দুই টুকরো টোস্ট পেলেই তৃপ্ত হত, কিন্তু এই প্রভাতী চায়ের বৈঠকটিকে প্রত্যহই অলংকৃত করতেন সুন্দরবাবু। তার কথা স্বতন্ত্র। ভুরিভোজন ছাড়া তার অসাধারণ উদরদেশটি পুলকিত হতে চাইত না কোনওদিন।

যথাসময়ে সুন্দবাবুর প্রবেশ। এসেই তিনি বলে উঠলেন, হুম! চা-টা শুরু হয়ে গেছে দেখছি। যা কাজের ভিড়। ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা অসম্ভব।

মানিক বললে, সাধু সুন্দরবাবু, সাধু! কাল রাতে আমাদের জন্যে অত খাটুনি খেটেও আজ সকালেই আবার কাজের ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন? ধন্য আপনার কর্তব্যনিষ্ঠা।

সুন্দরবাবু দস্তুরমতো ভয় করতেন মানিকের মুখরতাকে। মনে-মনে সে কী নতুন দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে বুঝতে না পেরে তিনি বললেন, কাল রাতে আমি আবার তোমাদের জন্যে কখন খেটে মরেছি? তুমি কি সকালের কথা বলছ? হ্যাঁ, কাল সকালে আমি দু-দুবার রাম-আছাড় খেয়েছি বটে। গায়ের ব্যথা এখনও মরেনি।

মানিক বললে, না না, আমি কালকের রাতের কথাই বলছি।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, মানিক কী বলতে চায় জয়ন্ত? কাল রাতে আমি তো শয্যাশায়ী ছিলুম, গায়ের ব্যথা কমাবার জন্যে স্ত্রীকে বার বার ওষুধ মালিশ করে দিতে হয়েছিল।

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, হ্যাঁ সুন্দরবাবু, কাল রাত্রে আমরা প্রাণে বেঁচেছি কেবল আপনার জন্যেই। তা সে কথা পরে হলেও চলবে, আগে আপনি চা খান, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

–হোক গে চা ঠান্ডা। তোমাদের আজব কথা শুনে এদিকে যে আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই করিনি।

মানিক গদগদকণ্ঠে বললে, আহা, আমাদের সুন্দরবাবু কী বিনয়ী!

বিনয়ের নিকুচি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, কাল সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে একবারও নামিনি।

সুন্দরবাবু, ভয়েভয়ে একটা কথা বলব?

কথা আবার কী?

–আপনি সোমনাবুলিস্ট নন তো?

–মানে?

আপনার নিদ্রাভ্রমণের ব্যাধি নেই তো?

–ও ব্যাধি শত্রুর হোক। তোমার হলেও আমি দুঃখিত হব না।

–আমি কি আপনার শত্রু?

–মাঝে-মাঝে আমার সেই সন্দেহই হয়।

–আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি বলতে চান, কাল রাতে বেহালার এক বাগানবাড়িতে আপনারা পাহারা দিতে যাননি?

–অসম্ভব মিথ্যা কথা!

–সেই বাগানে একদল লোকের হাতে আমরা হয়েছিলুম বন্দি। আপনিই আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন।

–আরব্য উপন্যাসের যে-কোনও গল্প এর চেয়ে সত্য। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মানিক।

–জয়ন্ত আমার সাক্ষী।

–শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, রাগ করবেন না সুন্দরবাবু। আসুন, এই চেয়ারে এসে বসুন। এই নিন স্যান্ডউইচ, এই নিন নিমকি, ডিম, কেক। এইবারে খেতে-খেতে চুপ করে আমার কথা শুনুন। মানিক একেবারে অমূলক কথা বলছে না।

সুন্দরবাবু খাবারের থালার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আবার হাতখানা টেনে নিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, তোমারও মতে মানিক সত্য কথাই বলছে? তাহলে এই রইল তোমার চায়ের পেয়ালা, এই রইল স্যান্ডউইচ আর যত কিছু ঘোড়ার ডিম। হুম! এই পাগলাগারদ ছেড়ে আমি এখন থানায় পলায়ন করতে চাই!

–আরে শুনুন মশাই, শুনুন। আপনি ঘটনাস্থলে স্বশরীরে হাজির থেকে আমাদের বাঁচাননি বটে, কিন্তু আমরা প্রাণে বেঁচেছি আপনারই নামের জোরে!

বটে! তাই নাকি? সুন্দরবাবু আবার বাহুবিস্তার করলেন, তারপর একখানা গোটা স্যান্ডউইচ বদনবিবরে নিক্ষেপ করে বললেন, আচ্ছা, তাহলে, তোমাদের কাহিনি শুনতে আমি নারাজ নই; বলো!

জয়ন্তের কাহিনি শুনতে-শুনতে সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। তারপর তিনি আহার্য গ্রহণ করতেও ভুলে গেলেন, মুখব্যাদান করে অবাক হয়ে কেবল গল্পই শুনতে লাগলেন। তারপর জয়ন্তের গল্প ফুরুল এবং শুরু হল সুন্দরবাবুর হো-হো-হো-হো হাসির ঘটা। দুই হাতে ভুড়ি চেপে ধরেও তিনি মিনিট-তিনেকের আগে দমন করতে পারলেন না সেই সর্বনেশে হাসির বিষম ধাক্কা।

অনেক কষ্টে আত্মস্থ করে সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত আমি স্বীকার করছি তুমি একটি জিনিয়াস। একেই বলে শূন্যহাতে কড়ি খেলা! তোমার প্রত্যুৎপন্নমতি হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় ভায়া, অপরাধীদের পালের গোদাকে একবারও তুমি দেখতে পেলে না।

–সে জন্যে দায়ী অন্ধকার।

কী বললে? লোকটার গলার আওয়াজ আধা কর্কশ আধা-কোমল?

–হ্যাঁ। শুনলে মনে হয়, একজন মানুষ যেন দুজনের গলায় কথা কইছে। এ-রকম কণ্ঠস্বর আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। আপনি শুনেছেন।

কই, মনে পড়ছে না তো!

–ভালো করে মনে করে দেখুন। সে আপনাকে চেনে। আপনার ওপরে তার ভারী আক্রোশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে হচ্ছে পুরাতন পাপী, কখনও না কখনও আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর আপনার কাছ থেকে জামাইআদর সে পায়নি।

সুন্দরবাবু স্মৃতি-সাগরে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তার মন স্মৃতি-সাগর আলোড়িত করেও নতুন কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না।

জয়ন্ত বললে, বেশ, তাহলে আর এক কাজ করবেন। সেই বাগানবাড়িখানার আশেপাশে পুলিশের গুপ্তচর মোতায়েন রাখবেন।

–বেশ, পাহারার ব্যবস্থা করব।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। জয়ন্ত ফোন ধরে বললে, হ্যালো!

মিনিটখানেক পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়াল আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে বলল, সুন্দরবাবু, উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! নিমতলার শ্মশানে এইমাত্র একটা আগুনে পোড়া মৃতদেহ এসেছে। চলো মানিক, জলদি।

.

দশ । কালো, রোগা, ঢ্যাঙা

নিমতলার শ্মশান। সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক মোটর থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু আবার ব্যর্থতা। একটা পুড়ে-মরা মানুষের লাশ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই মৃতদেহটা নিয়ে যারা এখানে এসেছিল, তাদের কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না।

পুলিশের যে জমাদারকে শ্মশানের ওপরে নজর রাখবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার দিকে ফিরে সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কি বাপু সাক্ষীগোপালের মতো হাঁ করে তাকিয়ে বসে গঙ্গার ঢেউ গুনছিলে?

জমাদার বললে, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর। লাশ তো আমিই আটকেছিলুম।

–যারা লাশ এনেছিল তাদের আটকালে না কেন?

–তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে। আমি বললুম, ওতেও চলবে না। থানার বড়বাবু এসে যদি হুকুম দেন, তবেই তোমরা লাশ পোড়াতে পারবে। তাদের একজন বললে, বেশ, লাশ এখানেই রইল, আমরা লরিতে বসে তোমাদের বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি।

লরি?

–হ্যাঁ হুজুর। মড়াটা এনেছিল তারা একখানা লরির উপরেই চাপিয়ে।

-তারপর?

–তারা আবার লরির ওপরে গিয়ে উঠল। তারপর লরিখানা হুশ করে ছুটে চোখের আড়ালে চলে গেল।

–আর তুমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

তা ছাড়া আর কী করব হুজুর? মানুষ তো লরির সঙ্গে ছুটতে পারে না।

লরিতে কজন লোক ছিল।

–চারজন।

তাদের আবার দেখলে চিনতে পারবে?

সবাইকে ভালো করে দেখবার সময় পাইনি। তবে যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা কইছিল, তার চেহারা আমার মনে আছে।

–সে কীরকম দেখতে?

–খুব কালো, খুব রোগা আর খুব ঢ্যাঙা; চোখে কালো চশমা।

হুম। জয়ন্ত, শুনছ?

–শুনছি। কিন্তু শুনে কী হবে, তাকে তো ধরতে পারলুম না!

–তারপর জমাদার, তুমি ডাক্তারের সার্টিফিকেটের কথা কী বলছিলে না?

– হুজুর; এই নিন সেই সার্টিফিকেট।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর সময় নষ্ট করবেন না। আমি হলপ করে বলতে পারি ওখানা হচ্ছে জাল সার্টিফিকেট। তার চেয়ে লাশটাকে দেখবেন চলুন, যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

শ্মশানের আঙিনার ওপরে ছিল মৃতদেহটা। মড়াটাকে পাহারা দিচ্ছিল একজন জীবন্ত লালপাগড়ি। খাটের ওপর থেকে নতুন কাপড়ের আবরণ সরিয়ে দেখা গেল একটা ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ মানুষের বিকৃত দেহ।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন এই লাশটাকে কী করা যায় জয়ন্ত?

–মর্গে পাঠিয়ে দিন। এর ফটো তুলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন; দেখুন যদি কেউ শনাক্ত করতে পারে।

–তুমি নতুন কোনও সূত্র-টুত্র আবিষ্কার করতে পারলে?

–উঁহুঁ।

–এখন কী করতে চাও?

সূত্র আবিষ্কারের জন্য অন্য কোথাও যাত্রা করতে চাই।

–সে কোথায়?

বরেনবাবুর বাড়িতে।

–সেখানকার সব সূত্র তো অগ্নিদেব গ্রাস করেছেন।

–আমি জানতে চাই, বরেনবাবুর ছোট ভাই কলকাতায় এসেছেন কিনা?

নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী?

হ্যাঁ।

–বেশ, চলো।

সকলে মোটরে গিয়ে উঠল। খানিক পরেই গাড়ি বরেনবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও সেখানে আগুন জ্বলছিল না বটে, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ বাড়িখানার চারিদিকেই বিরাজমান ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখার কালো দংশনচিহ্ন।

সদর-দরজার চৌকাঠের ওপরে ম্রিয়মান মুখে উবুড় হয়ে বসেছিল বরেনবাবুর প্রিয় ভৃত্য।

মানিক শুধোলে, কী হে, তোমাদের ছোটবাবু খবর পেয়ে দেশ থেকে এসেছেন?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসেছেন।

–আর কে এসেছেন?

–আর কেউ না। খবর শুনে গিন্নিমা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তিনি আসতে পারেননি।

–আমরা নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

–তিনি তো এখানে নেই।

–তবে কোথায় আছেন?

–বাবুর ছোটবোনের বাড়িতে।

–অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়িতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানিক ফিরে বললে, জয়ন্ত অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ি আমি চিনি। সেখানে বার দুয়েক নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

–উত্তম। তুমিই আমাদের পথপ্রদর্শক হও! আমাদের কোথায় যেতে হবে?

বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু গজ গজ করে বললেন, আমরা যেন স্রোতের শ্যাওলা, ক্রমাগতই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ভাসতে-ভাসতে কোথায় গিয়ে যে ঠেকব বাবা, তা ভগবানও জানেন কি না সন্দেহ!

মানিক বললে, দুনিয়ার মালিক ভগবানের হাতে অনেক কাজ। আমরা কোথায় ঠেকব কি ঠেকব না, তা নিয়ে ভাবনার সময় তার নেই।

গাড়ি প্রবেশ করল বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের ভিতরে।

মানিক বললে, ওই বাড়িখানা, ওই যে সামনে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির ওপরে চড়ে বসল। ট্যাক্সিখানা সচল হয়ে জয়ন্তদের গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আচম্বিতে জয়ন্তও নিজের গাড়ির মোড় ফিরিয়ে নিলে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, ওকী, কোথা যাও?

জয়ন্ত বললে, ওই ট্যাক্সির পিছনে।

–কেন হে?

–দেখতে পেলে না, সেই খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা।

.

এগারো । ঘুঘুর চাতুরি

মোটরের মোড় ফিরিয়েই জয়ন্ত দেখল, ট্যাক্সিখানা হঠাৎ ডান দিকের একটা রাস্তা ধরে সাঁত করে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তও সেই রাস্তা ধরলে।

ট্যাক্সির গতি তখন হয়ে উঠেছে দ্রুততর। জয়ন্তদের মোটরেরও গতি বেড়ে উঠল। দু-খানা গাড়ির সেই মারাত্মক দৌড় দেখে সচকিত পথিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, হা-রে-রে-রে কালো চশমা, আজ তোকে খাপে না পুরে ছাড়ব না। বারেবারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। এবার বধিব আমি তোমার পরান। হুম হুম হুম! আরও আরও জোরে জয়ন্ত, আরও জোরে।

মানিক বললে, আরও জোরে নয়। আরও জোরে গাড়ি ছোটালে ঘুঘু বধের আগেই পথের পথিক বধ হবে।

জয়ন্ত বললে, ঠিক বলেছ মানিক। খুনি ধরতে গিয়ে আমরাও মানুষ খুন করব নাকি? তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো; ট্যাক্সিখানা রিভলভারের নাগালের বাইরে যায়নি। তুমি গুলি ছুঁড়ে ওর টায়ার ফুটো করে দাও, পারবে?

মানিক রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপলে, একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয় গুলি বিদ্ধ করলে একখানা টায়ারকে। দুম করে জাগল এক আর্তনাদ। ট্যাক্সির দৌড় বন্ধ। তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্তদের মোটর।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সির হুডের তলায় মাথা চালিয়ে হতভম্ব সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে এ যে ভানুমতীর খেল! কোথায় সেই বেটা কালো চশমা?

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললেন, আপনার ঘুঘু এবারেও ফাঁকি দিয়েছে ফাঁদকে।

–কিন্তু কেমন করে?

–ট্যাক্সির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন।

–এই উল্লুক ড্রাইভার।

–হুজুর!

–আর হুজুর বলে আদিখ্যেতা করতে হবে না। সোজা জবাব দে। তোর বাবু বেটা গেল কোথায়?

–ও রাস্তা থেকে মোড় ফিরতেই বাবু আমার দিকে তিনখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বললেন, ভাড়া আর বকশিশ। জোরসে গাড়ি চালাও, থেমো না।

–আর তুমিও অমনি তার হুকুমে ভোঁ দৌড় মারলে?

দু-তিন টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা পেলে কে না কথা শোনে হুজুর? কিন্তু আমার লাভের গুড় পিঁপড়ের খেয়েছে, আপনারা আমার টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছেন।

–বেশ করেছি, খুব করেছি। এখনও তোর মাথা ফাটাইনি, এই তোর ভাগ্যি!

–আমার মাথা ফাটাবেন কেন হুজুর?

–ডাঙায় এসে তুই নৌকা ডুবিয়ে দিলি বলে।

–আমি? আমি কিছুই জানি না হুজুর, ও বাবুকে এর আগে কখনও চোখেও দেখিনি।

–বেশ, থানায় গিয়ে ও কথা বলিস।

–আমি কেন থানায় যাব?

–সুন্দরবাবু জবাব দিলেন না। তখন গাড়ি ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অনেক কৌতূহলী লোক। একজন পাহারাওয়ালাও ছিল। সুন্দরবাবু তারই হাতে সপে দিলেন ট্যাক্সিওয়ালাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কী মনে হচ্ছে জানো? খুনি আমাদের জয়ন্তের চেয়েও চালাক।

–খুনি, জয়ন্তের চেয়েও চালাক কিনা জানি না, কিন্তু আপনার চেয়ে যে চালাক, সে বিষয়ে আর একটুও সন্দেহ নেই।

যা মুখে আসে বলো বাবা, বলো। তোমার কাছে আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ছাড়া তো আর কিছুই নই।

–যা বললুম, সত্য।

–প্রমাণ দাও।

–যা স্বপ্রকাশ, তার জন্যে প্রমাণের দরকার নেই।

–মানে?

দুপুর রৌদ্রেও আকাশে সূর্য আছে কিনা জানবার জন্যে কেউ প্রমাণের খোঁজ করে না।

সুন্দরবাবু ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললেন, আরে রেখে দাও তোমার বাগাড়ম্বর, আমি খুনির মতো চালাক না হতে পারি, কিন্তু তোমার মতো নিরেট গর্দভ নই।

জয়ন্ত নিজের মনে কী চিন্তা করছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে, মানিক, তোমার কি বিশ্বাস, আমরা নতুন কোনও সূত্র পাইনি।

তাই তো আমার ধারণা।

–তোমার ধারণা ভ্রান্ত।

–কেন?

–বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বলো দেখি, অন্নপূর্ণাদেবী বরেনবাবুর কোন বোন?

–সধবা ছোটবোন।

তার সন্তান আছে?

না।

–তুমি বলেছিলে বরেনবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই নরেনবাবুই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

হুঁ।

নরেনবাবুর সন্তানাদি কী?

–তিনি বিবাহই করেননি।

জুয়া খেলে তিনি সম্পত্তির অধিকাংশই উড়িয়ে দিয়েছেন।

–হ্যাঁ।

–তাহলে এখন তার টাকার টানাটানি।

খুব সম্ভব তাই।

–এখনও তার জুয়ার নেশা আছে?

–থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন?

–মানিক, একটু মাথা ঘামাও। ভালো করে ভেবে দ্যাখো, নরেনবাবু যে বাড়িতে এসে উঠেছেন, সেখান থেকে ওই কালো চশমাপরা রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বেরিয়ে এল কেন? ও যে খুনিদের দলের লোক, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই বাড়ির সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক? ও লোকটা অন্নপূর্ণাদেবীর স্বামী নয় তো?

নিশ্চয়ই নয়! অন্নপূর্ণাদেবীর স্বামীকে আমি চিনি।

তবে কি ও লোকটা নরেনবাবুর বন্ধু?

–আমি জানি না।

–কিন্তু জানতে হবে মানিক, জানতেই হবে। সর্বাগ্রে ওইটাই জানা দরকার। আজ একটা বড় সূত্র পেলুম। চলো, বরেনবাবুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আসি। বন্ধু, মানুষ চেনা বড় কঠিন।

.

বারো । যা করেন মা কালী

পথে আসতে-আসতে সুন্দরবাবু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন–ঠিক, ঠিক, ঠিক।

মানিক, সচমকে বললে, কী ব্যাপার? সুন্দরবাবুর মগজের ভিতরে ঝড় উঠল নাকি?

ঝড় নয় মূর্খ, ঝড় নয়।

–তবে?

–আমি চিন্তা করছিলুম।

–চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে নাকি?

চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে না বটে, কিন্তু চিন্তা করবার পর লোকে অনায়াসেই চিৎকার করতে পারে।

–বেশ চিন্তামণি মশাই, আপনার মূল্যবান চিন্তাটা কী শুনি?

–এ না হয়েই যায় না।

কী না হয়ে যায় না?

–ওই নরেনবাবু–

হুঁ বলুন।

ওই নরেনবাবুটির ওপরে আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে।

-কেন?

জয়ন্ত ঠিক আন্দাজ করেছে, নরেনবাবু লোকটি বড় সহজ মানুষ নয়। খুনিদের দলের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতায়–

বাধা দিয়ে মানিক বললে, থামুন। আপনার চিন্তার দৌড় বুঝতে পেরেছি। আপনার চিন্তাকে অত বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে দেবেন না, হোঁচট খেয়ে শেষটা সে খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।

বাক্যবাণ ছোড়বার জন্যে তুমিও অত বেশি জিভ নেড়ো না বাপু, জিভখানা শেষে খসে পড়তে পারে।

দুজনেরই মুখ বন্ধ হল। গাড়ি আবার এসে থামল অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ির দরজায়।

বেয়ারা মানিককে চিনত। সকলকে বৈঠকখানায় বসিয়ে নরেনবাবুকে খবর দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতরে বরেনবাবুর প্রবেশ।

সুন্দর চেহারা। একহারা, কিন্তু মাননসই দেহ, টকটকে রং, চোখ-নাক ঠোঁট যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সূক্ষ্ম একটি গোঁফের রেখা। মুখখানি যেন সরলতার প্রতীক! কিন্তু তার ভাবভঙ্গি আজ বিষাদের দ্বারা আচ্ছন্ন।

সকলের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেন বললে, এই যে মানিকবাবু নমস্কার। এঁরা কারা?

জয়ন্ত ও সুন্দরবাবুর পরিচয় দিলে মানিক। নরেনের দুই ভুরু সঙ্কুচিত হল। সে বললে, আমার মন আজ ভালো নয়, বেশিক্ষণ কথা কইতে পারব না, এজন্যে অপরাধ নেবেন না।

জয়ন্ত এতক্ষণ দেওয়ালের একখানা বড় আয়নার ভিতরে প্রতিবিম্বিত নরেনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে। সে ফিরে বললে, আজ আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না। আপনার কাছে এসেছি কেবল একটি কথা জানবার জন্যে।

কী কথা বলুন।

–আজ এই বাড়িতে একটি লোক এসেছিল, তারই পরিচয় জানতে চাই।

–আমি কলকাতায় এসেছি শুনে, আজ সকাল থেকেই তো এখানে অনেক লোক আনাগোনা করছেন। আপনি কার কথা জানতে চান?

–প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এখানে একটি লোক এসেছিল।

ঘণ্টাখানেক আগে জন-তিনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

–আমি যার কথা বলছি সে একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে এসেছিল। সে খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা। তার চোখে কালো চশমা।

–ও, বুঝেছি। কিন্তু তাকে আমি চিনি না।

–চেনেন না?

না। সে কেবল একখানা চিঠি দিতে এসেছিল।

–চিঠি? কার চিঠি?

–তাও বলতে পারব না।

–কেন?

–পত্রলেখক পত্রে নিজের নাম-সই করেনি। কিন্তু পত্রখানা রহস্যময়।

চিঠিখানা একবার দেখতে পারি।

নরেন ইতস্তত করে বললে, পত্রলেখক চিঠির কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছে!

এইবার সুন্দরবাবু কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করলেন। বললেন, মশাই আপনার দাদার হত্যাকারীকে আপনি শাস্তি দিতে চান?

–নিশ্চয়!

বরেনবাবুর হত্যাকারীকে আবিষ্কার না করে ছাড়ব না। এই চিঠিখানার ভিতরে হয়তো কোনও সূত্র থাকতে পারে। সুতরাং

–বেশ, চিঠিখানা দেখুন তাহলে। কিন্তু এর ভিতরে হত্যাকারীর নাম ধাম কিছুই নেই। নরেন পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সমর্পণ করলে জয়ন্তের হাতে।

চিঠিখানা খুলে দুই-তিন পংক্তি পাঠ করেই জয়ন্তের দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে সেই কাগজখানা সে বার করলে, বরেনবাবুর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে যেখানা পাওয়া গিয়েছিল চশমার খাপের মধ্যে। দুখানা কাগজের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখে জয়ন্ত মৃদু হাস্য করলে, যেন আপন মনেই। তারপরে সে উচ্চৈঃস্বরে পত্র খানা পাঠ করলেঃ

নরেনবাবু, আপনার দাদার হত্যাকারীর নাম শুনতে চান? তাহলে আজ রাত্রি সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বরাহনগরের ২০ নম্বর রতন রায় রোডে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। একাই আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতুম, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বেরুলেই আমার বিপদের সম্ভাবনা, কারণ হত্যাকারী আমারও গতিবিধির ওপরে লক্ষ রেখেছে। সাবধান, পত্রের মর্ম কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। ইতি।

চিঠিখানা নরেনবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, তা হলে রাত্রে আপনি পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?

–তাই তো স্থির করেছি।

–বেশ করেছেন। আপনার যাওয়াই উচিত। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এসো মানিক, আসুন সুন্দরবাবু। পথে এসে গাড়িতে উঠে মোটর চালিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

কীরকম?

–আজকের চিঠি আর সেই চশমার খাপের চিঠি একই লোকের লেখা। তার ওপরে পত্রবাহকও খুনিদের দলের লোক।

–আচ্ছা, নরেনবাবুকে তারা কোন উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে?

–উদ্দেশ্য হয়তো ভালো নয়। কিন্তু আমরা ঘটনাস্থলের আশেপাশে লুকিয়ে থাকব। আপনি একদল সশস্ত্র পাহারাওয়ালা নিয়ে আসবেন। তারপর যা করেন মা কালী!

.

তেরো। রাত সাড়ে নয়টা

বরাহনগর। কুড়ি নম্বর রতন রায় রোড। একখানা পুরোনো দোতলা বাড়ি, তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় বড় গাছ। জমির ওপরে গাছগুলোর আশেপাশে ঝোপঝাড়। এক সময়ে এখানে বোধহয় বাগানের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ফুলগাছদের তাড়িয়ে এখন তাদের স্থান দখল করেছে বেশ একটি ছোটখাটো জঙ্গল।

বাড়ির দোতলায় একখানা ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে পড়েছে আলোর রেখা। বাড়িতে ঢোকবার পথ আর বড় রাস্তার সংযোগস্থলে হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল একটা মূর্তি। রাত বোধহয় তখন নয়টা বাজে।

এতক্ষণ ঝিঁঝিদের একঘেয়ে গান ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না, হঠাৎ স্তব্ধতাকে যেন ধাক্কা মেরে খানিক দূরে বেজে উঠল এক মোটরের ভেঁপু! লণ্ঠন হাতে নিশ্চল মূর্তিটা চমকে উঠল। তার পরেই শোনা গেল একখানা চলন্ত গাড়ির শব্দ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একখানা ট্যাক্সি। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে একজন লোক।

গাড়িখানা বাড়ির কাছে এসে থামল। তার আরোহী লণ্ঠনধারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে, মশাই বলতে পারেন, এ বাড়িখানার নম্বর কত?

কুড়ি।

বটে, এই বাড়িখানাই তো আমি খুঁজছি।

আপনি কি নরেনবাবু?

–হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন?

–আপনার জন্যেই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

–আমার জন্যে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়বাবু আপনাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

–কে বড়বাবু?

–আমার কর্তা। আসুন, গাড়ি নিয়ে ভিতরে আসুন বলেই লোকটা গাড়ির পাদানির ওপরে উঠে দাঁড়াল।

চালক লোকটার নির্দেশমতো গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকে সেই পুরোনো বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটা নেমে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে, আসুন নরেনবাবু।

নরেন একটু ইতস্তত করে গাড়ি থেকে নেমে বললে, ড্রাইভার।

হুজুর!

গাড়ি নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো। আমি এখনি ফিরে আসছি।

–যে আজ্ঞে।

লোকটার সঙ্গে নরেন বাড়ির ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাক্সিচালক একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর গাড়িখানাকে পিছু হটিয়ে পথের এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে, যেখানে দু-পাশেই আছে দুটো বড় ঝোপ।

মিনিট পাঁচেক যায়। দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা কোকিলের কুহু স্বর। কাছে ঝিঁঝিদের গলার ওপরে গলা তোলবার চেষ্টা করছে একটা কোলা ব্যাং। মাঝে-মাঝে হঠাৎ জাগা বাতাসে সবুজ পাতাদের শিহরন গান। তাছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

লণ্ঠন হাতে করে একটা লোক আসছে। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে চালককে ডেকে বললে, তোমার মিটারে কত ভাড়া উঠেছে?

–কেন?

নরেনবাবুর ফিরতে দেরি হবে। হয়তো আজ রাত্রে তিনি ফিরতে নাও পারেন। ভাড়া নিয়ে তিনি তোমাকে চলে যেতে বললেন।

–বেশ, ভাড়া দিন পাঁচ টাকা।

লোকটা লণ্ঠন তুলে হুমড়ি খেয়ে মিটারে কত ভাড়া উঠেছে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পরমুহূর্তে চালকের প্রচণ্ড একটা ঘুসি গিয়ে পড়ল ঠিক তার চিবুকের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে টু-শব্দ পর্যন্ত করবার সময় না পেয়ে লোকটা হল ধরাশায়ী। একেবারে অজ্ঞান!

চালক মৃদুকণ্ঠে ডাকল, মানিক!

পাশের ঝোপ থেকে সাড়া এল, উ!

–বেরিয়ে এসো। সুন্দরবাবু!

হুম!

–আপনিও বেরিয়ে আসুন।

–এই যে ভায়া!

–আগে ওই লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলুন। ওর এখনও জ্ঞান হয়নি।

লোকটাকে বন্দি করতে বেশিক্ষণ লাগল না।

চালক-বেশী জয়ন্ত বললে, এখানকার সব প্রস্তুত?

–হ্যাঁ।

আচম্বিতে বাড়ির ভিতরে জেগে উঠল প্রচণ্ড হট্টগোল। একাধিক ব্যক্তির ক্রুদ্ধ চিৎকার। তারপরই উপর-উপরি দুইবার রিভলভারের গর্জন! আর্তনাদ! পরমুহূর্তে দোতলার ঘরের আলোটা গেল নিভে।

জয়ন্ত বললে, আর দেরি নয় সুন্দরবাবু। ডাকুন আপনার লোকজনদের।

পকেট থেকে বাঁশি বার করে সুন্দরবাবু খুব জোরে দিলেন তিনবার ফুঁ।

জয়ন্ত দ্রুতপদে বাড়ির দিকে ছুটে গেল–পিছনে-পিছনে মানিক।

.

চোদ্দো । অদ্ভুত রহস্য

দুজনেই দৌড়ে বাড়ির সদর-দরজার কাছে হাজির হল। দুজনেরই হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, মানিক, আমি এখানেই থাকি। চরের মুখে শুনেছি, বাড়ির পিছন দিকেও একটা খিড়কির দরজা আছে। তুমি সেইখানে গিয়ে পাহারা দাও।

তারপর?

–যদি কেউ বাড়ির বাইরে যাবার চেষ্টা করে গুলি করবে–অর্থাৎ প্রাণে মারবে না, কেবল রিভলভার ছুঁড়ে ভয় দেখাবে।

–বেশ।

সুন্দরবাবু এখুনি লোকজন নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলবেন। আমাদের বেশিক্ষণ পাহারা দিতে হবে না।

মানিক ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ গুড়ুম শব্দে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল। গাছে গাছে কাক ও অন্যান্য পাখিদের ভীত চিৎকার।

জয়ন্ত আপন মনেই বললে, বন্দুক ছুড়লে কে? শব্দটা এল যেন বাড়ির ওপর থেকে! মানিকের কোনও বিপদ হল না তো?

ধুপ ধুপ করে ভারী ভারী পা ফেলে সুন্দরবাবু উধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে কেবল তিনবার বললেন, হুম, হুম, হুম!

–ব্যাপার কী?

কী কাণ্ড, বাপ!

কাণ্ড আবার কী?

–মাথার ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে এক্ষুনি প্রাণপক্ষী বহির্গত হয়ে যেত।

বুঝিয়ে বলুন।

–কোথা থেকে কোন ব্যাটা ত্যাঁদোড় আমার মাথা টিপ করে বন্দুক ছুঁড়েছিল।

–গুলি লাগেনি তো?

লাগেনি মানে। নিশ্চয় লেগেছে, আলবত লেগেছে।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, তবু আপনি মাটির ওপরে লম্বমান হননি।

–কেন লম্বমান হইনি দেখতে পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে মাথায় আমি স্টিল হেলমেট পরে নিয়েছি যে। উঃ নইলে কী সর্বনাশই যে হত!

–ও আলোচনা এখন থাক। আপাতত যে বন্দুক ছুঁড়েছে তাকে ধরতে হবে তো।

নিশ্চয়ই।

এমন সময় মানিক এসে বললে, আমার আর খিড়কিতে থাকবার দরকার নেই জয়ন্ত। দ্বাররক্ষা করবার জন্যে পাহারাওয়ালারা এসে পড়েছে।

–খিড়কি দিয়ে কেউ বেরুবার চেষ্টা করেনি?

জনপ্রাণী না।

সুন্দরবাবু পরম আহ্লাদে বললেন, ব্যাটারা তাহলে বাড়ির ভিতরে আছে, এবারে আর আমাদের কলা দেখাতে পারবে না। চলো জয়ন্ত, আমার আর তর সইছে না।

আপনার মাথায় হেলমেট আছে, আপনিই পথ দেখান। কেউ যদি গুলি ছোড়ে, হেলমেট দিয়ে ঠেকাবেন।

কিন্তু কেউ আর বন্দুক ছুড়ল না, বাড়ির ভিতরটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। একতলার সব ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও একটা মিশকালো বিড়াল ছাড়া আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে, এইবার দোতলা। বন্দুকের শব্দটা এসেছিল দোতলা থেকেই।

সুন্দরবাবু হলেন পশ্চাদপদ। পাহারাওয়ালাদের ডেকে বললেন, তোমরা আগে আগে যাও। যাকে দেখবে তাকে গ্রেপ্তার করবে। ভয় নেই, আমি তোমাদের পিছনেই আছি।

দোতলায় চারখানা ঘর। সব ঘরই খাঁ-খাঁ করছে। কিন্তু একখানা ঘরের রক্তপ্লাবিত মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে একটা রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু আপনারা বাড়ির ছাদটা একবার খুঁজে আসুন। আমি এই ঘরেই আছি।

ছাদও শূন্য। হতভম্ব সুন্দরবাবু হেলমেট খুলে টাক চুলকোতে চুলকোতে নেমে এসে দেখলেন, জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা রিভলভার।

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাটারা মায়াবী। হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, এই রিভলভারটাই আমি নরেনবাবুকে দিয়েছিলুম। কিন্তু অস্ত্রটা এখানে ফেলে নরেনবাবু গেলেন কোথায়?

–হুম, সেই বন্দুকধারীই বা কোথায়?

মানিক বললে, ঘরের মেঝেয় এত রক্ত কার? নরেনবাবু নয় তো?

জয়ন্ত বললে, সম্ভবত নয়। আমরা রিভলভার ছোড়বার শব্দ শুনেছি দুই বার। এই রিভলভারেও ছয়টা ঘরের ভিতরে দুটো ঘরে গুলি নেই। আমার বিশ্বাস আত্মরক্ষার জন্যে নরেনবাবুই গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের কাউকে হত বা আহত করেছেন।

মানিক বললে, কিন্তু নরেনবাবুই বা কোথায়, আর তার হত কি আহত শত্রুর দেহটাই বা কোথায়? এই বাড়ির ভিতর থেকে সুন্দরবাবুর টাক ফাটাবার জন্যে যে লোকটা বন্দুক ছুঁড়েছিল, সেও তো তার বন্দুক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!

মানিক, মেঝের রক্তের ওপরে কতকগুলো পদচিহ্ন রয়েছে দ্যাখো। আমি পরীক্ষা করে ছয়জন লোকের পদচিহ্ন পেয়েছি। একজনের পা খুব বড়, বোধহয় মাথাতেও সে খুব ঢ্যাঙা।

কী আশ্চর্য! বাড়ির কোনও দরজা দিয়েই কোনও লোক বাইরে বেরুতে পারেনি, কিন্তু এতগুলো মানুষ কি শূন্যপথে পাখির মতো উড়ে পালিয়েছে?

–মানিক, এ ঘরের দরজা দিয়েও কেউ বাইরে যায়নি।

–কেমন করে জানলে?

–তাহলে রক্তাক্ত দেহটা থেকে নির্গত রক্তের ধারা ঘরের বাইরেও দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বাইরে কোথাও এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই।

সুন্দরবাবু মহা বিস্ময়ে দুই ভুরু কপালে তুলে বললে, তাও তো বটে, তাও তো বটে! ঘরের ভিতরে অনেকগুলো লোক ছিল, কিন্তু তারা ঘরের ভিতরেও নেই আর ঘরের বাইরেও যায়নি! অবাক করলে বাবা!

মানিক বললে, প্রায় আসবাবহীন ঘর। চারিদিকে ইটের দেওয়াল। একটা টিকটিকিও এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। এ কী সমস্যা?

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, এই সমস্যার সমাধান না করে আমি এখান থেকে নড়ব না।

.

পনেরো । ভৌতিক রহস্য

সুন্দরবাবু ঘুরে-ঘুরে ঘরের চারিদিক দেখে নিলেন সন্দিগ্ধ চোখে। তারপর হেলমেটটা আবার মাথায় পরে ফেললেন।

মানিক বললে, ও কী মশাই, ওটা আবার মস্তকে ধারণ করলেন কেন? এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ তো নেই।

–এখন নেই, কিন্তু এখনি তারা দেখা দিতেও পারে। যে সব শত্রু ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় না, অথচ ঘরের ভিতরেও থাকে না, তাদের বিশ্বাস নেই। তারা মায়াধর, তারা সব করতে পারে।

মানিক নিজের রিভলভারের পিছন দিকটা দিয়ে ঘরের চারিদিকের দেওয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী দেখছ মানিক?

–দেখছি দেওয়ালের কোনও জায়গা ফাঁপা কি না! কিন্তু না, এ নিরেট দেওয়াল, এর কোথাও গুপ্তঘার নেই।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু বলতে বলতে থেমে পড়ে সে পশ্চিম দিকের একটা জানলার কাছে ছুটে গেল।

মানিক বললে, কী হল জয়ন্ত?

–এ দিকের জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়।

–সেটা আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কথা কইতে কইতে তুমি হঠাৎ ছুটে গেলে কেন?

–একটা শব্দ শুনছ না?

কান পেতে মানিক বললে, শুনছি। একখানা মোটরবোটের শব্দ।

–হ্যাঁ। গঙ্গার ওপর দিয়ে একখানা মোটরবোট যাচ্ছে।

–মোটর-বোটের শব্দটা আগে ছিল না, এই মাত্র জাগল। নিশ্চয় বোটখানা ছাড়া হয়েছে। কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে। এতরাত্রে বোটে চড়ে গঙ্গার হাওয়া খাবার শখ হল কোন মহাপুরুষদের, সেই কথাই ভাবছি।

সন্দেহজনক বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, জনকয় সেপাইকে গঙ্গার ধারে পাঠাব নাকি?

–এখন আর পাঠিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে বোটখানা অনেক দূরে চলে গিয়েছে, আর তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব!

তুমি কি বলতে চাও যে–

বাধা দিয়ে জয়ন্ত বললে, আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি আপনাকে একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।

কী?

একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, যে দেওয়ালে জানলাটা গাঁথা আছে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরবাবু বিপুল বিস্ময়ে বললেন, ওরে বাবা, এত মোটা দেওয়াল তো আমি জীবনে কখনও দেখিনি!

–ঘরের অন্য তিনদিকের দেওয়াল দেখুন। কোনও দেওয়ালই তো চওড়া নয়!

–তাই তো হে। এর মানে কী?

–সেইটেই বিবেচ্য।

–হুম, এ যেন চিনের প্রাচীরের নমুনা।

–এইবার মেঝের রক্তের দিকে তাকান। কী দেখছেন?

–একটু অত্যুক্তি করলে বলা যায়, মেঝের ওপর দিয়ে বইছে রক্তের ঢেউ।

আর কিছু দেখছেন না?

রক্তের মাঝে-মাঝে অনেকগুলো মানুষের পায়ের দাগ।

আর কিছু।

–উঁহু!

–মানিক, তুমি কী বলো?

–পশ্চিম দিকে রয়েছে একটা দেওয়াল-আলমারি। একটা লম্বা রক্তের রেখা ওই আলমারির তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। যেন কোনও আহত রক্তাক্ত লোক ওই আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

–সে আহত না হয়ে, মৃত হতেও পারে। হয়তো কারা তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ওই পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

–কিন্তু কেন? দেহটাকে আলমারির ভিতরে রেখে দেবে বলে?

হতেও পারে, না হতেও পারে। আলমারিটা খুলেই দ্যাখো না!

–কিন্তু আলমারিটা তো বাহির থেকে তালাবন্ধ।

–ভারী তো পুঁচকে তালা। ভেঙে ফ্যালো।

–তালা ভাঙতে দেরি লাগল না। একটা বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত হলেন সুন্দরবাবু।

কিন্তু আলমারির দরজা খুলে পাওয়া গেল কেবল চারটে তাক। সেগুলোর ওপরে রয়েছে কয়েকটা আজে-বাজে জিনিস।

জয়ন্ত বললে, আর-একটা জিনিস লক্ষ করুন সুন্দরবাবু।

–ভায়া, বার বার লক্ষ করতে করতে আমি ক্রমেই লক্ষ্যহারা হয়ে পড়ছি যে।

–আলমারির ফ্রেমের ওপরে রয়েছে একটা পিতলের মোটা হাতল।

–তাতে কী হয়েছে?

–ওরকম জায়গায় অমনধারা হাতল থাকার কোনও মানে হয় না।

–হুম!

–হাতলটা ধরে জোরসে মারুন টান!

–মারলুম টান–হেঁইয়ো। আরে, এ কী!

হড় হড় করে গোটা আলমারিটাই দরজার পাল্লার মতো দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে। জয়ন্ত ছাড়া আর আর সকলেরই দৃষ্টি বিস্মিত এবং চমকিত। জয়ন্ত সহজ কণ্ঠেই বললে, এ-মানিক, আলমারির ওপাশে কী আছে, এইবারে সেটা দেখা যাক।

আলমারির ওপাশে আছে দুটো দেওয়ালের মাঝখানে হাত-দেড়েক চওড়া আর অল্প একটু ফাঁকা জায়গা–সেখানে পাশাপাশি দুজন মানুষ দাঁড়াতে পারে না। নীচে গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে নেমে গিয়েছে একসার ছোট ছোট সিঁড়ি।

জয়ন্ত অগ্রসর হল! এক হাতে টর্চ এবং আর এক হাতে রিভলভার নিয়ে সেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, আমার বিশ্বাস শত্রুদের কেউ আর এ মুল্লুকে নেই। আপনারাও নির্ভয়ে আমার পিছনে আসুন।

মোট ত্রিশটা ধাপ। তারপর সিঁড়ির শেষ।

এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলে জমাট অন্ধকার বিদীর্ণ করে জয়ন্ত বললে, বাড়িখানা আছে, আমাদের মাথার উপরে–এখন আমরা পাতালের গর্ভে। এখানটা দেখছি ছোটখাটো ঘরের মতো, আর

জয়ন্তের কথা ফুরুবার আগেই সেই অন্ধকূপের মধ্যে বিকট একটা ভৌতিক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—হুঁ-উ-উ-উ! হু- উ- উ- উ!

মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করে আবার সিঁড়ির ওপরে গিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, এ কী রে বাবা, এ কী আওয়াজ! পালিয়ে এসো জয়ন্ত পালিয়ে এসো মানিক।

.

ষোলো । পাতাল-পুরে

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল, সেই দিকে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল চোখের পলক পড়বার আগেই।

টর্চের আলোতে দেখা গেল এক কোণে মেঝেয় ওপরে পড়ে রয়েছে একটা নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-মুর্তি—তার মুখে বন্ধন, তার হাতে বন্ধন, তার পায়ে বন্ধন।

মানিক দুই পা এগিয়ে হেঁট হয়ে মূর্তিটাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, নরেনবাবু না?

নরেন নিঃসহায়ের মতো ঘাড় নেড়ে কেবল বলতে পারলে, হু- উ- উ- উ!

জয়ন্ত ও মানিক তৎক্ষণাৎ তার বন্ধন খুলে দিলে।

সিঁড়ির ওপর থেকে আবার নীচে নামতে নামতে সুন্দরবাবু হাঁফ ছেড়ে বললে, নরেনবাবু, এভাবে আমাদের ভয় দেখানো উচিত হয়নি। হু-উ-উ-উ-উ কী রে বাবা!

নরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, কী করব বলুন, ও ছাড়া আর কোনও শব্দ উচ্চারণ করবার উপায় আমার ছিল না।

জয়ন্ত বললে, ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন?

–পারব। বাড়ির উপরকার ঘরে ওঠবার পর একজন খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোক আমার সঙ্গে অল্পক্ষণ বাজে কথা কইলে। তারপরেই অতর্কিতে পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করলে কয়েকজন লোক। কোনওক্রমে একবার তাদের হাত ছাড়িয়ে আমি উপর-উপরি দুইবার রিভলভার ছুড়লুম– একটা লোক জখম হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকি লোকগুলো আবার আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁধে ফেললে আমার হাত পা মুখ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে কী করত জানি না, কিন্তু হঠাৎ বাইরে আপনাদের বাঁশি বেজে উঠল। রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বললে, পালাও পালাও–পুলিশ এসেছে। তখন আমার আর সেই আহত লোকটার দেহ মাটির ওপর থেকে তুলে নিয়ে তারা দেওয়ালের একটা গুপ্তদ্বার খুলে সিঁড়ি দিয়ে এইখানে নেমে এল। আসবার সময়ে সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা বোধহয় আপনাদের লক্ষ করে একবার বন্দুকও ছুঁড়েছিল।

জয়ন্ত শুধোলে, নরেনবাবু, সে লোকটার গলার আওয়াজ কেমন?

–স্বাভাবিক।

–আধা নরম আধা কর্কশ নয়?

না।

–মানিক, তাহলে বোধ হচ্ছে বেহালার বাগানবাড়িতে যে আমাদের সঙ্গে কর্তৃত্বের স্বরে কথা কয়েছিল, সে আর এই রোগা-ঢ্যাঙা লোকটা একই ব্যক্তি নয়। আচ্ছা নরেনবাবু, আপনাকে এখানে ফেলে রেখে লোকগুলি কোন দিকে গিয়েছে বলতে পারেন?

–হ্যাঁ। তারা ওই দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। নরেন অঙ্গুলিনির্দেশ করল। দেওয়ালের গায়ে রয়েছে ছোট একটা দরজা, তার কপাট বন্ধ ছিল না।

জয়ন্ত দরজার ওপাশটা টর্চের সাহায্যে আলোকিত করে বললে, এ যে একটা সুড়ঙ্গ!

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, বাব্বাঃ, এরা দেখছি জাত শয়তান! আয়োজনের কিছুই বাকি রাখেনি। কেবল স্থলপথে জলপথেই ওদের চলাচল নয় হে জয়ন্ত, ওরা হয়তো এরোপ্লেনে উঠেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারে।

জয়ন্ত ভাবতে-ভাবতে বললে, আমার মনে হয়, এদের একজন বিচক্ষণ দলপতি আছে। সাধারণত সে নিজে থাকে আড়ালে আড়ালে নিরাপদ ব্যবধানে, আর তার হুকুম তামিল করে দলের অন্য সবাই। ওই রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা হয় তার ডান হাতের মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার মনে হয়, এই অদৃশ্য দলপতি কোনওদিনই দৃশ্যমান হবে না। ধরা পড়বে বড় জোর তার চেলা-চামুন্ডারা।

দলপতিকে চোখে না দেখলেও খুব সম্ভব আমরা তারই অর্ধ-কোমল আর অর্ধ-কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনেছি–সে স্বর আমি কোনওদিনই ভুলব না, কারণ সযত্নে তার রেকর্ড রেখেছি আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে। তার স্বর আবার শুনলেই তাকে চিনতে পারব। আর এটাও জেনেছি, আপনার ওপরে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। নিশ্চয় সে পুরাতন পাপী, কখনও না কখনও আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর বোধহয় আপনি তাকে জামাই-আদর করেননি।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমার ওই অর্ধ-কোমল-অর্ধ-কর্কশ কণ্ঠের অধিকারীকে আমি তো স্মৃতি-সাগর মন্থন করেও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

–আপাতত থাক ও-কথা। নরেনবাবু, আপনি দুইজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আবার ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন। ততক্ষণে আমরা সুড়ঙ্গটার ভিতরে দৃষ্টি সঞ্চালন করে আসি।

সুড়ঙ্গটাও সংকীর্ণ, তার ভিতরে পাশাপাশি চলতে পারে না দুজন মানুষ। বেশ খানিকটা এগিয়ে যেখানে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে, সেখানেও রয়েছে আর একটা ছোট দরজা; টানতেই খুলে গেল তার কবাট।

বাহির থেকে দরজার ওপরে ঝুলছে এত লতাপাতা যে সহজে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। তারপর প্রায় কাঠা-চারেক জমি জুড়ে বিরাজ করছে কাঁটা-ঝোপের পর কাঁটাঝোপ আর আগাছার নিবিড় জঙ্গল।

জয়ন্ত স্তব্ধ মুখে সেই দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে আঘাটাতেও গঙ্গার জলবাহু ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোর হিরের টুকরো।

খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে বললে, মানিক পুলিশের সাড়া পেয়ে ওরা তাড়াতাড়িতে নরেনবাবুকেও নিয়ে পালাতে পারেনি। আমরা যে গুপ্তপথের সন্ধান পাব, সেটা ওরা আন্দাজ করতে পারবে না। নরেনবাবুর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই দু-এক দিনের মধ্যে লুকিয়ে আবার সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবে।

–তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়।

–সে সুযোগ আমরা ছাড়ব না। তারা আসবে রাতের অন্ধকারেই। আমরাও কাল থেকে এইখানে রাত জেগে গঙ্গার গান শুনব। এবারে সুড়ঙ্গে ঢুকলে আর তারা বেরুতে পারবে না। আপনার নরেনবাবুকে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। তাঁকে যে আমরা উদ্ধার করেছি, সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।

–মন্দ ফন্দি নয়। এখন চলো, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

.

সতেরো। বিজনবিহারী রায়

তারপর কেটে যায় এক, দুই, তিন দিন। জয়ন্ত সদলবলে রাত জাগে বাহনগরের গঙ্গার ধারে। কেবল তারা নয়, সে-মুল্লুকের মশাও সানন্দে ঐকতান বাজিয়ে রাত জাগে তাদের সঙ্গে । সুন্দরবাবুর অভিযোগের অন্ত নেই।

তিনদিন পরে জয়ন্তও হাল ছেড়ে দিল। সে বুঝল, নরেনবাবুর জন্যে অপরাধীরা আর সুড়ঙ্গের মধ্যে পদার্পণ করবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, আমি তো গোড়া থেকেই বলে আসছি ওরা আমাদের চেয়ে চালাক। এত সহজে ফাঁদে পা দেবার বান্দা ওরা নয়।

জয়ন্ত বললে, আমার মত আলাদা। ওদের আসল উদ্দেশ্য এইবার বুঝতে পেরেছি।

-মানে?

–ওদের ইচ্ছা, নরেনবাবু অন্ধকূপে বন্দি হয়ে তিলে তিলে দিনে-দিনে মৃত্যুর কবলগত হোন। ওরা নরেনবাবুকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ওরা ভাবছে ওদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কাজেই অকারণে সুড়ঙ্গের ভিতরে এসে ওরা আর পুলিশের নজরে পড়তে রাজি নয়।

কিন্তু নরেনবাবুকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে ওদের এতটা আগ্রহ কেন?

–এখনও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে যে কারণে বরেনবাবু মারা পড়েছেন, সেই কারণেই ওরা নরেনবাবুকে বধ করতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই।

–এ আবার তোমার কীরকম হেঁয়ালি! এদিকে বলছ তুমি সঠিক উত্তর জানো না, আবার বলছ ওরা একই কারণে বরেনবাবুকে বধ করবার পরে বরেনবাবুকেও বধ করতে চায়!

সুন্দরবাবু, আপাতত এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। তবে এই মামলাটা হাতে নিয়েই আমার মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, অবশেষে সেই সন্দেহই বোধ করি সত্যে পরিণত হবে। আপনি আজ সন্ধ্যার সময়ে আমার বাড়িতে একবার আসবেন?

আসব। কিন্তু কেন বলো দেখি?

–আমাদের বরানগর অভিযান তো ব্যর্থ হল, আজ আর একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করব।

.

সেদিনের সন্ধ্যা।

জয়ন্ত বৈঠকখানায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং মানিক ধরেছে তবলা।

সুন্দরবাবুর প্রবেশ। দুই বন্ধুর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন। অধীরভাবে একবার হুম শব্দ উচ্চারণ। কিন্তু জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না। সমান তালে বাজাতে লাগল বাঁশি আর তবলা।

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, বললেন, কী হে জয়ন্ত বাঁশির প্যানপ্যানানি শোনবার জন্যেই কি আজ আমাকে এখানে আসতে বলেছ?

উত্তর নেই। বাঁশি আর তবলা বোবা হল না।

আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসেছিলুম একটা জরুরি খবর দিতে। তা তোমরা যখন শুনবে না আমি আর কী করব বলো? চললাম।

মানিকের তবলায় পড়ল তেহাই, জয়ন্তের বাঁশি হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত বললে, আপনি জানেন তো সুন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাবার জন্যে আমার প্রাণ আনচান করে।

মানিক বললে, আর তবলা বাজাবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করে।

হুম! ও দুটো যন্ত্রই আমাকে দেয় যম-যন্ত্রণা।

জয়ন্ত বললে, তবে সেতার শুনবেন?

–মানিক বললে, কিংবা

বাধা দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, রক্ষা করো! আবার সেতারের প্রিং প্রিং! ওসব আমি বুঝিও না, ভালোও লাগে না।

মানিক বললে, তবে আপনার কী ভালো লাগে সুন্দরবাবু? আমাদের মধু যদি এখন চা আর ফাউলের স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে?

সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, তাহলে মধুকে আমি একাধিক ধন্যবাদ দেব।

–বেশ সেই ব্যবস্থাই হবে।

তবে আমিও আবার বসলুম।

জয়ন্ত বললে, একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারিনি।

সুন্দরবাবু বললেন, আমারও বক্তব্য আছে। আগে তোমার কথাই শুনি।

–বেহালায় গিয়েছিলুম। আশেপাশের লোকের কাছে খবর নিয়ে জানলুম, দশ নম্বর রামবাবুর লেনের সেই বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন বিজনবিহারী রায়। কিন্তু তিনি নাকি আর কলকাতায় বাস করেন না।

–বটে! তাহলে আমার খবর শুনবে? আমি তোমারও চেয়ে অগ্রসর হয়েছি।

সুসংবাদ!

–নিমতলার সেই আগুনে-পোড়া মৃতদেহটার ছবি কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করে। আজ একজন লোক তাকে শনাক্ত করে গিয়েছে।

–কে শনাক্ত করেছে?

–তার নাম হরিয়া। সে বেহালার ওই বাগানবাড়িতে আগে মালির কাজ করত। হরিয়া বলে, আগুনে পুড়ে যে লোকটা মরেছে সে হচ্ছে বাগানবাড়ির মালিক বিজনবিহারী রায়ের মোটর চালক।

–তাহলে আপনি বিজনবাবুরও ঠিকানা পেয়েছেন?

উঁহুঁ। হরিয়া বলে বিজনবাবু কলকাতায় বাসা তুলে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

কিন্তু কে এই বিজনবিহারী রায়?

–তাও জেনেছি ভায়া, তাও জেনেছি। সেইজন্যেই তো বলছি আমি তোমারও চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছি।

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, বলুন সব কথা খুলে বলুন।

–বেহালা বাগানবাড়িতে তুমি একজনের আধা-কোমল আধা কর্কশ গলার আওয়াজ শুনেছিলে না?

–হুঁ।

–বিজনবিহারীও ওই রকম অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের অধিকারী।

–কেমন করে জানলেন?

–শোনো। হরিয়া মালির মুখে বিজনবিহারী রায়ের নাম শুনেই সজাগ হয়ে উঠেছে। আমার ঘুমন্ত স্মৃতি। তুমি বলেছিলে সেই আধা-কোমল আর আধা-কর্কশ কণ্ঠের অধিকারীর নাকি আমার ওপরে রাগ আছে। সেই যদি বিজন হয় তাহলে আমার ওপরে তার রাগ থাকবার কথা। কারণ বছর পাঁচেক আগে তাকে একটা খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছিলুম। মামলা

অনেকদিন ধরে চলেছিল, তাকেও হাজতে আবদ্ধ থাকতে হয়। শেষটা যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায় বটে, কিন্তু আসলে বিজনই যে হত্যাকারী, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। জয়ন্ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বরেনবাবুর হত্যাকাণ্ডেও সেই বিজনের হাত আছে।

–কিন্তু বিজন এখন কোথায় জানেন না তো?

তার ঠিকানা জানি না বটে, তবে মাসখানেক আগেও সে কলকাতায় ছিল বলেই শুনেছি।

কার মুখে শুনেছেন?

–ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এক ইন্সপেক্টরের মুখে। বিজনকে তিনি মোটরে চড়ে পথ। দিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললে, সুন্দরবাবু, আপনি মূল্যবান সংবাদ এনেছেন। আর আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হবে না। বিজন যখন কলকাতাতেই আত্মগোপন করে আছে, তখন তাকে আবিষ্কার করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তার পরেই বোঝা যাবে বর্তমান মামলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কতখানি!

.

আঠারো । ভাগনে

চা এবং খাবার এল–সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সুন্দরবাবু বদনমণ্ডল। তাঁর জীবনের সেই সময়টাই সবচেয়ে উপভোগ্য, যখন তাঁর ডানহাতখানি খাবারের থালার দিকে বার বার আনাগোনা করবার সুযোগ পায়।

খেতে-খেতে সুন্দরবাবু বললেন, দ্যাখো জয়ন্ত, বিজন কলকাতা ত্যাগ করেনি বলেই ভালো। কলকাতা হচ্ছে জনসমুদ্রের মতো, আর বিজন হচ্ছে তার মধ্যে এক ঘটি জলের

মতো। ঘটির জল সমুদ্রে মিশে গেলে কেউ কি তাকে আবিষ্কার করতে পারে হে? বরং কলকাতায় বাইরে গেলেই সে সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই দ্যাখো না, বিজন আর আমি দুজনেই কলকাতায় আছি, অথচ আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তার চুলের টিকি পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

জয়ন্ত বললে, খোঁজেননি, তাই তার দেখা পাননি। খুঁজলে ভগবানের দেখা পেতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু শয়তান ধরা দেয় খুব সহজেই।

মানিক বললে, কিন্তু জয়ন্ত, বিজন যে বরেনবাবুর হত্যাকারী আর সেই যে নরেনবাবুকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণই আমরা পাইনি। আমরা বড়জোর তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনেছি, কিন্তু আদালতে সেটা ঠিক প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে কি?

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, হুম! মানিক প্রায়ই বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে না, কিন্তু তার আজকের কথার দাম লাখ টাকা।

মানিক মুখ টিপে হেসে বললেন, আমি কেমন করে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলব সুন্দরবাবু? ষোলো আনা বুদ্ধিই যে আপনার মগজের ভিতরে বন্দি হয়ে আছে। বলছেন, আমার কথার দাম লাখ টাকা। এমন করে আমায় আর লজ্জা দেবেন না দাদা। আপনার কাছে আমি? শাখামৃগের কাছে নেংটি ইঁদুর।

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, শাখামৃগ মানে কী জয়ন্ত?

–শুনলে কি খুশি হবেন?

–কেন হব না?

মানেটা ভালো নয়।

–তবু আমি শুনব। শাখামৃগ মানে কী?

কপি।

কী কপি, ফুলকপি? ফুলকপিও নয়, বাঁধাকপিও নয়–শুধু কপি। অর্থাৎ বানর।

সুন্দরবাবু একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর মানিকের ভাবহীন মুখের দিকে প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হন হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, সুন্দরবাবুকে তাড়ালে মানিক?

উনি তাড়া খেয়ে চলেও যান, আবার তাড়াতাড়ি ফিরেও আসেন।

–যাক ওকথা। এখন বাড়ির ভিতর থেকে একবার বরেনবাবুকে ডেকে আনো দেখি। তার সঙ্গে দুটো কথা কইব।

মানিক চলে গেল এবং মিনিট-তিনেক পরে বরেনবাবুকে নিয়ে ফিরে এল।

নরেন বললে, আর অজ্ঞাতবাস ভালো লাগছে না জয়ন্তবাবু।

বসুন। আর আপনাকে অজ্ঞাতবাস করতেও হবে না। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছি, আমাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

–শুনে বাঁচলুম।

–আচ্ছা নরেনবাবু, আপনার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?

–আমি।

নরেনবাবু উইল করে গেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার সন্তান আছে?

না।

স্ত্রী?

–বিবাহ করিনি, কখনও করবও না।

–আপনার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?

–আমার ভাগনে।

–শুনেছি আপনার ভগ্নী বন্ধ্যা।

–সে আমার ছোট বোন! আমার বিধবা দিদির ছেলে আছে।

কয় ছেলে?

–একটি মাত্র।

বটে? তার বয়স কত?

–সে প্রায় আমারই সমবয়সি।

তিনি কী করেন?

–জানি না।

–সে কী?

–আশ্চর্য হচ্ছেন? আশ্চর্য হবার কথাই বটে। আসল কথা কী জানেন জয়ন্তবাবু? দিদির সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব আছে বটে, কিন্তু আমার ভাগনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি।

–কেন?

–সে মানুষ নয়, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া। তার কথা স্মরণ করতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

দুঃখের কথা!

–লোক ঠকানো তার ব্যবসা। একবার খুনের মামলাতেও পড়েছিল।

জয়ন্ত চমকে উঠলে। একটু চুপ করে জিজ্ঞাসা করলে, তার নাম কী?

–বিজনবিহারী রায়।

জয়ন্ত ও মানিকের মধ্যে হল দৃষ্টি বিনিময়। জয়ন্ত বললে, বিজনবাবুর কণ্ঠস্বর কি অর্ধ-কোমল অর্ধ-কর্কশ?

আর একদিনও কার সম্বন্ধে আপনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। হা, বিজনের গলার আওয়াজ ওইরকমই বটে। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে?

–আমি শুনেছি।

–কোথায়?

–পরে বলব। বিজনবাবুর চেহারা কেমন?

–লোক বলে নাকি অনেকটা আমার মতনই দেখতে।

–তার ঠিকানা কী?

–তাও জানি না। সে আমার দিদির সঙ্গে থাকে না। তবে এত দোষের মধ্যেও তার একটি মস্ত গুণ আছে। সে অত্যন্ত মাতৃভক্ত। রোজ সকালে একবার করে আমার দিদির সঙ্গে দেখা করে যায়।

–আপনার দিদির ঠিকানা কী?

–পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট।

কাল সকালে সেখানে গেলে বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে তো?

–হওয়াই তো উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী দরকার?

জয়ন্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, তার সঙ্গে দেখা হবার পরে বলব। কিন্তু সাবধান নরেনবাবু, আমি যে কাল বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।

.

উনিশ । টেলিফোনের কীর্তি

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। নরেনবাবুর দিদির বাড়ি।

তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি কলকাতা। শেষরাতের আঁধারের সঙ্গে ঊষার আলোর যুঝাবুঝি চলছে তখনও। শহরের ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু তার মুখরতা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

যথাসম্ভব আত্মগোপনের জন্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে জয়ন্ত বললে, মানিক, মাতৃভক্ত হত্যাকারীর জন্যে বোধকরি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! তা হোক, একটু আগে আসাই ভালো।

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। তার দরজার এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি। আরোহী নীচে নেমে ভাড়া দিলে। ট্যাক্সি চলে গেল।

জয়ন্ত বললে, ওই কি বিজনবিহারী? লোকটাকে দেখতে অনেকটা বরেনবাবুর মতোই বটে–এমনকী গায়ের রং পর্যন্ত। দেখলে, বাড়িতে ঢোকবার আগে বিজন চারিদিকে কীরকম সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে গেল?

মানিক বললে, আমাদের দেখতে পায়নি তো?

আশা করি পায়নি।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে তারা দুজনে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। দরজার কড়া নাড়তেই একজন বেয়ারা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই?

–বিজনবাবুকে।

–তিনি তো এই সবে এলেন।

তাকে গিয়ে বলো দুজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বেয়ারার প্রস্থান।

বেয়ারা ফিরে এসে বললে, আপনারা বাইরের ঘরে বসুন। বাবু এখনি আসছেন।

বেয়ারা বৈঠকখানার দরজা খুলে দিলে। ঘরের ভিতরে ঢুকল জয়ন্ত ও মানিক। পরমুহূর্তেই দরজা বন্ধ হওয়ার ও বাহির থেকে শিকল-তোলার শব্দ হল।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, এই! দরজা খুলে দাও। কারুর সাড়া নেই।

মানিক বললে, যা ভেবেছি। বিজন হয় সন্দেহ করছে, নয় রাস্তায় আমাদের দেখে চিনে ফেলেছে। আমরা বন্দি।

জয়ন্ত বললে, ভারি বোকা বানালে তো! দেখছি ঘর থেকে বেরুবার আর কোনও পথ নেই। সে দরজা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। লাথি ও ধাক্কা মারতে লাগল দরজার উপরে।

মানিক বললে, বৃথা চেষ্টা করছ কেন? তোমার গায়ে যত জোরই থাক, ঘরের ভিতর থেকে এই মজবুত দরজা কিছুতেই ভাঙতে পারবে না, অন্য উপায় দেখো।

কী উপায় আছে আর? ঘরটা যদি রাস্তার ধারেও হত চেঁচিয়ে পথের লোক ডাকতে পারতুম।

ঘরের বাইরে জাগ্রত হল হা-হা-হা-হা করে অট্টহাস্য। তারপরেই সেই পরিচিত অর্ধ কোমল ও অর্ধ-কর্কশ কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, কী হে শার্লক হোমস আর ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ! গোয়েন্দাগিরি ভারি সোজা, নয়?

জয়ন্ত বললে, দরজা খুলে দাও বিজন। আমাদের বন্দি করে তুমি কিছুই সুবিধে করতে পারবে না। পুলিশ তোমার নাম জানতে পেরেছে।

পুলিশকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোদের কী হাল হয় দ্যাখ-সেদিন বড় কঁকি দিয়েছিলি। এই সঙ্গে ভঁদো সুন্দর-গোয়েন্দাটাকে পেলেই সোনায় সোহাগা হত। যতসব নেড়াবুনে, সব-হল কীর্তনে। সবাই মহা ডিটেকটিভ!

মানিক চুপি চুপি বলল, জয়ন্ত মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছি।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, কীরকম?

ওই দ্যাখ টেবিলের ওপরে টেলিফোন। এবার সত্য-সত্যই সুন্দরবাবু এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন।

জয়ন্ত এক লাফে টেবিলের সামনে গিয়ে পড়ল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে সুন্দরবাবুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে। বললে, সুন্দরবাবু আমরা আবার বিজনের হাতে বন্দি হয়েছি। সদলবলে শীঘ্র পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিটে এসে আমাদের উদ্ধার আর বিজনের গ্রেপ্তার করুন।

বিজন বোধহয় কান পেতে ছিল। হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, হায়রে, আবার আমার ভুল হয়ে গেল! ঘরে যে টেলিফোন আছে, সেটা আমার মনে ছিল না।

এবারে ঘরের ভিতর থেকে একসঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠল জয়ন্ত এবং মানিক। ঘরের বাইরে আর কেউ হাসবার চেষ্টা করলে না।

মিনিট দশেকের মধ্যে ঘটনাস্থলে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। জয়ন্ত মানিকের উদ্ধারলাভ। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বিজনের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু আপশোশ করে বললেন, কী ঘ্যাঁচড়া মাছ রে বাবা! যতবার জাল ফেলি ততবার ছিঁড়ে পালিয়ে যায়!

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, আমার হাতের সব তাস এখনও ফুরোয়নি।

ফুরোয়নি নাকি?

–না। বরানগরের বাড়িতে বিজনের দলের যে লোকটা ধরা পড়েছিল, সে এখন কোথায়?

হাজতে।

–তাকে আজকেই ছেড়ে দিন।

কী বলছ?

–ঠিকই বলছি। চুনোপুঁটিকে ছেড়ে দিলে যদি রুই-কাতলা ধরা পড়ে আপত্তি কী?

–তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না।

–মানে খুব সহজ! হাজতে সে একলা আছে?

হ্যাঁ।

–আরও ভালো। প্রহরী যদি হাজতঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে সরে দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চয়ই সে চম্পট দেবে।

–দেবেই তো।

–সেও সন্দেহ করতে পারবে না যে তাকে আমরা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিচ্ছি।

তারপর?

তারপর তার পিছনে চর মোতায়েন রাখুন। সে কোথায় যায় দেখুন।

–তুমি কি ভাবছ, সে সোজা বিজনের কাছে গিয়েই হাজির হবে!

নিশ্চয়ই বিজনের কোনও গুপ্ত আস্তানা আছে। তার পক্ষে কলকাতা যখন বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সেইখানেই গিয়ে সে গা-ঢাকা দেয়। বিজন এখন বেশ কিছুদিন বাইরে মুখ দেখাতে সাহস করবে বলে মনে হচ্ছে না। দলের লোকজন নিয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। আমাদের বন্দি নিশ্চয়ই তার গুপ্ত আস্তানার খবর রাখে। তার পক্ষে সেইখানে যাওয়াই স্বাভাবিক।

–হ্যাঁ জয়ন্ত, তোমার অনুমান সঙ্গত।

–তাহলে এই উপায় অবলম্বন করুন।

তথাস্তু।

.

কুড়ি । অপচয়ে ঠ্যাং

পরদিন প্রভাতেই জয়ন্তের ঘরের টেলিফোন যন্ত্র বেজে উঠল টুং টুং টুং।

রিসিভার ধরেই জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবুর প্রফুল্ল কণ্ঠের সম্বোধন–ভো-ভো জয়ন্ত!

–গলা শুনেই বুঝেছি খবর শুভ।

–অত্যন্ত এবং আশাতীত। পরে পরে এই ব্যাপারগুলো ঘটেছে। বিজনের অনুচরের হাজত থেকে পলায়ন। আমাদের চরের তার পিছনে অনুসরণ। হাওড়ায় গিয়ে বিজনের অনুচরের ট্রেনে আরোহণ। পরে তার হরিহরপুরে অবতরণ। তারপর গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে একখানা বাড়িতে তার গমন।

–আপনার চর নিশ্চয়ই বিজনের দর্শন পায়নি?

–বিজনকে সে চেনে না। তবে শুনলুম, সে বাড়িতে লোক আছে আটদশ জন।

হরিহরপুর এখান থেকে কতদূর?

–পঁয়ত্রিশ মাইল।

–অতঃপর?

–তিনখানা সেপাই ভর্তি বড় জিপগাড়ি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে যাচ্ছি। গাড়িতে তোমার আর মানিকের জন্যেও একটু জায়গা থাকবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে পারবে তো?

–আমি কোনও সময়েই অপ্রস্তুত নই।

–সোনার ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।

.

হরিহরপুর ছোট গ্রাম। কিন্তু তার প্রান্তে আছে প্রকাণ্ড এক প্রান্তর এবং প্রান্তরের প্রান্ত। গিয়ে মিশেছে দিকচক্রবালরেখায়।

প্রান্তরের মাঝখানে চারিদিকে কলাইশুটি খেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রাচীরে ঘেরা নিঃসঙ্গ বাড়ি। তার পিছন দিকে গুটি-আষ্টেক নারিকেল গাছ করেছে নিরালা একটি কুঞ্জ রচনা, তা ছাড়া আর কোনও গাছপালা নেই তার আশেপাশে।

তীক্ষ্ণ চক্ষে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করে জয়ন্ত বলল, সুন্দরবাবু, বিজন আস্তানা নির্বাচন করেছে চমৎকার। পুলিশ যে-কোনও দিক দিয়েই অগ্রসর হোক, লুকিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। সে এখন মরিয়া হয়ে উঠছে নিশ্চয়ই, দিনের আলোয় আমরা যদি ওদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওরা ধরা পড়লেও আমাদের লোকক্ষয় অনিবার্য, কারণ ওরা বাধা দেবেই, আর ওদের সঙ্গেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে, ওদের বাড়িটাও প্রায় কেল্লার মতো। রাত্রির অন্ধকারের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত।

সন্ধ্যার ছায়ায় পৃথিবী হয়ে উঠল অস্পষ্ট। তারপর এল রাত্রি। চারিদিকে, চাঁদের আলোয় নীরব খেলা। ইতিমধ্যে একবার গলাসাধা হয়ে গেল শৃগাল-সভ্যদের।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম,–চারিদিক থেকে অগ্রসর হল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, নিঃশব্দে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। বাড়ির প্রাচীরের কাছে এসেও পাওয়া গেল না কারুর সাড়াশব্দ। বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দেখা গেল বাহির থেকে তালা বন্ধ।

কয়েকজন লোক প্রাচীর লঙঘন করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরে তারা ফিরে এসে বললে, বাড়ির ভিতরে কেউ নেই।

মানিক বললে, যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। আমাদের মতো ওরাও নিয়েছে রাত্রির সুযোগ। সবাই লম্বা দিয়েছে। আমাদের হল লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং।

জয়ন্ত হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, এত সহজে হতাশ হোয়ো না মানিক। ওরা টের পেয়েছে আমাদের অস্তিত্ব। কিন্তু পালিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বড়জোর স্টেশনের দিকে। তিন ঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে একখানা মাত্র স্লো প্যাসেঞ্জার আসবে সন্ধ্যার পর, সাড়ে আটটার সময়ে। এখন ঘড়িতে আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। স্টেশনে মোটরে চড়ে পৌঁছোতে আমাদের সাত-আট মিনিটের বেশি দেরি লাগবে না। এসব লোকাল ট্রেন প্রায়ই দেরি করে স্টেশনে আসে। হয়তো এখনও আমরা গিয়ে ট্রেন ধরতে পারব।

বায়ুবেগে ছুটল তিনখানা জিপগাড়ি। কিন্তু তারা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেই দেখলে, একখানা ট্রেন ধূম উদগার করে দৌড় মারলে সশব্দে। তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেন এসেছিল আজ প্রায় যথাসময়েই।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, দৌড়ে স্টেশনে যান। পরের স্টেশনে খবর দিন, ট্রেন ওখানে গেলেই যেন আটকে রাখা হয়। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটবে আমাদের গাড়ি তিনখানা। খুব সম্ভব পরের স্টেশনে আগে গিয়ে পৌঁছোব আমরাই।

সুন্দরবাবু স্টেশনে ছুটলেন। এবং কাজ সেরে ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠলেন। আকাশের গায়ে চলন্ত ট্রেনের ধোঁয়ার রেখা লক্ষ করে পুলিশের গাড়িগুলো হল ঝড়ের

বেগে ধাবমান। তারপর চলল ট্রেনের সঙ্গে মোটরের দৌড়-পাল্লা। খানিক পরে মোটরই এগিয়ে গেল ট্রেনকে পিছনে ফেলে।

ধু-ধু মাঠের মধ্যে আচম্বিতে ট্রেনের গতি হয়ে গেল স্তব্ধ।

মানিক বললে, ব্যাপার কী?

জয়ন্ত বললে, বিজনের নতুন কীর্তি। অ্যালার্মের শিকল টেনে গাড়ি থামিয়ে ওরা এইখান থেকেই লম্বা দিতে চায়। ওরা বুঝে নিয়েছে পরের স্টেশন ওদের পক্ষে নিরাপদ হবে না। সুন্দরবাবু সবাইকে নিয়ে টপ করে নেমে পড়ুন। ওই দেখুন অপরাধীরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ে মাঠের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ওই সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা, আর ওই লোকটা বোধহয় বিজন। ওরা দূরের ওই জঙ্গলটা লক্ষ করে ছুটছে। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছোবার আগেই ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে, নইলে আবার ওরা পূর্বেকার মতো আমাদের কলা দেখাতে পারে।

এবারে গাড়ির সঙ্গে গাড়ির নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতা।

হঠাৎ রোগা-ঢ্যাঙা লোকটা এবং বিজন দৌড় থামিয়ে ফিরে দাঁড়াল-তাদের দুজনেরই হাতে বন্দুক।

জয়ন্ত বললে, হুশিয়ার!

ওরা বন্দুক ছুড়ছে। মানিক অস্ফুট আর্তনাদ করে মাঠের ওপরে পড়ে গেল। তার ডান পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি!

সুন্দরবাবু সক্রোধে বললেন, কী! আবার গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। তবে দ্যাখ মজাটা। এই সেপাই, চালাও গুলি চালাও গুলি।

পুলিশের এক ডজন বন্দুক সগর্জনে অগ্নি ও ধূম উদগিরণ করতে লাগল বারংবার। মাঠের মধ্যে এই অকল্পিত খণ্ডযুদ্ধ দেখে চারিদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল কাতারে কাতারে লোকজন।

জয়ন্ত বললে, বিজন, আত্মসমর্পণ করো।

একটা মরা গাছের কাটা গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বন্দুকে কার্তুজ ভরতে লাগল বিজন। সে কোনও জবাব দিলে না।

জয়ন্ত বলল, বিজন, শুনছ?

বিজন বললে, হ্যাঁ শুনেছি। তোমাদের কথার উত্তর হচ্ছে এই-সে বন্দুক তুলে জয়ন্তের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

পাশেই ছিল একটা মস্ত উই ঢিপি। জয়ন্ত এক লাফে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হা-হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, কী হে বীরপুরুষ, ভয় পেয়ে লুকোলি কেন?

জয়ন্ত শান্তস্বরেই বললে, বিজনবিহারী তুমিও তো লুকোতে কসুর করোনি। আর কেন যাদু, লীলাখেলা বন্ধ করো। এগিয়ে এসো, দুই হাতে লোহার বালা পরো। আমরা তোমাকে গুলি করে মারতে চাই না, ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে চাই।

বিজন বন্দুকের নল ফেরাল সুন্দরবাবুর দিকে।

সুন্দরবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে করলেন প্রকাণ্ড একটি লম্ফত্যাগ। তিনি একেবারে সেপাইদের দলের ভিতর গিয়ে পড়লেন। তারপর দারুণ ক্রোধে চিৎকার করে বললেন, কী, আবার আমাকে বধ করবার চেষ্টা? মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো ছোটলোকটাকে, এখুনি গুলি করে মেরে ফ্যালো।

জয়ন্ত বললে, বিজন, বন্দুক ছাড়ো।

–প্রাণ থাকতে নয়।

–তাহলে প্রাণ তোমার যাবেই। দলে আমরা ভারী।

–হোক। যতক্ষণ বাঁচব, যুদ্ধ করব।

–তবে মরো।

সেপাইরা গুলিবৃষ্টি বন্ধ করেছিল। তারা আবার বন্দুক ছুঁড়তে লাগল এবং গর্জন করতে লাগল বিজনেরও বন্দুক।

কিন্তু যুদ্ধ বেশিক্ষণ চলল না। অধিকাংশ অপরাধীই একে-একে ভূতলশায়ী হল–কেউ নিহত, কেউ আহত।

সগর্বে মাথা তুলে এবং বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল বিজনবিহারী। গুলিহীন বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতে নিলে সে রিভলভার। মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

জয়ন্ত বললে, আবার বলছি, এখনও আত্মসমর্পণ করো বিজন।

দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে কর্কশ-কোমল কণ্ঠে বিজন বললে, পুঁচকে গোয়েন্দা আমি আত্মসমর্পণ করব না, আমি করব জীবন সমর্পণ। চোখের পলক না পড়তেই রিভলভারের নলটা নিজের কপালের পাশে রেখে সে ঘোড়া টিপে দিলে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন–সঙ্গে সঙ্গে বিজনবিহারীর পতন।

জয়ন্ত বললে, ওকে বাধা দিতে পারলুম না। তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে যে মাতুল হত্যা করে তার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠেই দোল খেয়ে। যাক মানিক, তোমার কি বেশি লেগেছে ভাই?

না জয়ন্ত। কিন্তু যা বলেছিলাম। আমার হল অপচয়ে ঠ্যাং।

সুন্দরবাবু সহানুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে দুঃখিতভাবে বললেন, হুম!